সম্পূর্ণ উপন্যাস

অদৃশ্য নজরদার

সুকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়

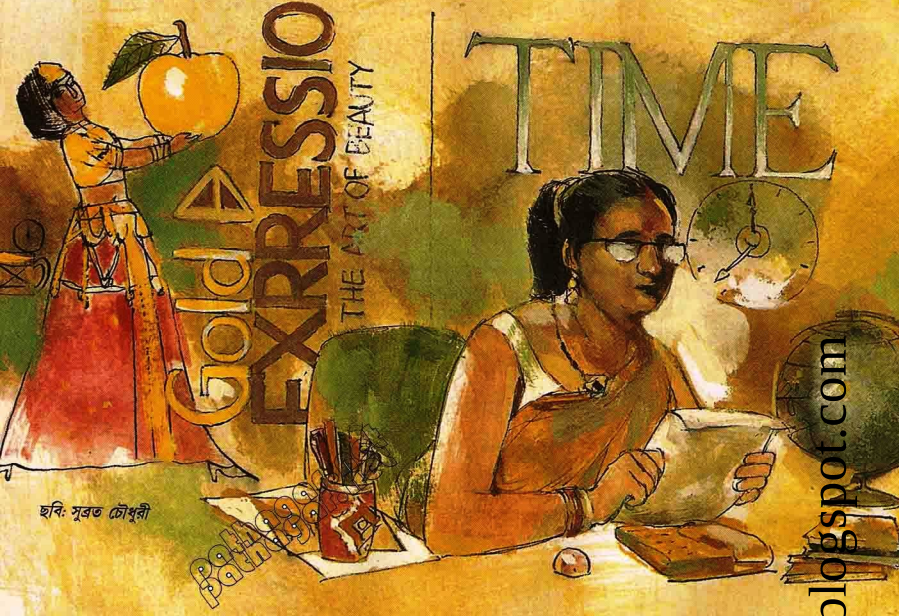

ছবি: সুব্রত চৌধুরী

ফুটপাত ধরে হাঁটছে ঝিনুক। মুর অ্যাভিনিউ ছেড়ে চণ্ডী ঘোষ রোডে ঢুকতেই টের পায়, একটা গাড়ি তাকে ফলো করছে। কখন থেকে করছে কে জানে! গিয়েছিল কাছেই, শ্রবণাদের বাড়ি। শ্রবণার নতুন ডিভিডি প্লেয়ার দেখতে। ওদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে অন্যমনস্ক ছিল ঝিনুক। ভাবছিল, বাবাকে কীভাবে কনভিন্স করবে একটা ডিভিডি কিনে দেওয়ার

boierpathshala.blogspot.com

জন্য। তখন থেকেই কি ফলো করছে গাড়িটা? হঠাৎ ফলো করারই বা কী হল! সে তো এই সময় দীপকাকুর কোনও কেস-এ অ্যাসিস্ট করছে না। তা হলে কি পুরনো কোনও শত্রু?

সেই আশঙ্কাও বেশ কম। এ পর্যন্ত দীপকাকুর সঙ্গে যে ক'টা তদন্তে সে ছিল, শত্রু জিইয়ে থাকার মতো পরিস্থিতি নেই। তবু বলা তো যায় না!

গাড়ির লোকটার আসল উদ্দেশ্য কি ঝিনুকদের বাড়িটা চিনে রাখা? বাড়ি এখান থেকে মিনিটদেড়েক। ওই তো উলটো দিকের ফুটপাতে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। আর-একটু এগিয়ে ঝিনুক রাস্তা ক্রস করবে। কিন্তু লোকটার উদ্দেশ্য তো সফল হতে দেওয়া যায় না। মোটামুটি ফিটপাঁচেকের দূরত্ব বজায় রেখে গড়িয়ে আসছে গাড়ি, কিছু একটা করতেই হয়।

হঠাৎই হোঁচট খাওয়ার ভান করে দাঁড়িয়ে গেল ঝিনুক। ড্রাইভারটা ফলো করায় তেমন পোক্ত নয়। এসে পড়েছে ঝিনুকের পাশে। এমনটাই চাইছিল ঝিনুক। সরাসরি ড্রাইভারের জানলার কাছে গিয়ে জানতে চায়, "কী ব্যাপার বলুন তো, ফলো করছেন কেন আমাকে?"

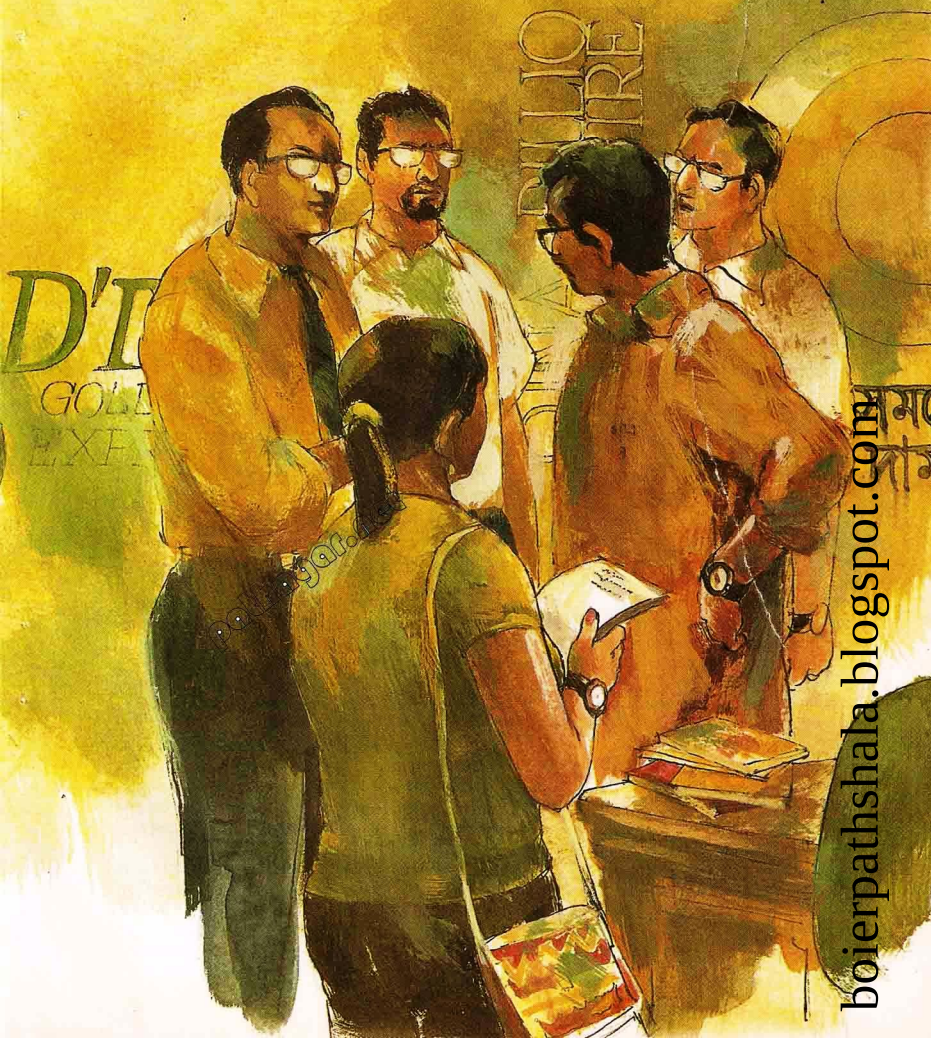

boierpathshala.blogspot.com

ঝিনুকের রুদ্রমূর্তি দেখে ঘাবড়ে গিয়েছে ড্রাইভার। ব্রেক কষেছে গাড়ির। মুখ থেকে কথাও বেরোচ্ছে না তার। একজন নিরীহ, বয়স্ক মানুষ। ফলো করার মতো কাজ এদের মানায় না। ঝিনুক ফের একবার ধমকাতে যাবে, পিছনের সিটে বসে থাকা সাহেবি চেহারার এক ভদ্রলোক বলে ওঠেন, "এক্সকিউজ মি, অ্যাকচুয়ালি হয়েছে কী, পিছনের মোড়ে একজনকে জিজ্ঞেস করলাম, রজত সেনের বাড়ি কোথায়? বলল, এই সামনে। তারপর তোমাকে দেখিয়ে বলল, মেয়েটা যে বাড়িতে ঢুকবে, ওটাই রজত সেনের বাড়ি। কিন্তু তুমি তো হেঁটেই যাচ্ছ!"

হাসির বুড়বুড়ি ভেসে উঠতে চাইছে ঝিনুকের মুখে, গাড়ির ভদ্রলোক পড়েছিলেন কোনও বেআক্কেলের পাল্লায়। হাসি চেপে ঝিনুক বলে, "আমি রজত সেনের মেয়ে।"

ভদ্রলোক বলেন, "তেমনটাই আন্দাজ করেছি। তোমাকে আর জিজ্ঞেস করিনি, সামনেই যখন বাড়ি, বাড়িতেই আলাপ হবে।" একটু থেমে আশঙ্কার গলায় বলেন, "আমরা তোমাদের বাড়ি ছাড়িয়ে যাইনি তো? তুমি কি অন্য কোথাও যাচ্ছ?"

"না না। ওই তো আমাদের বাড়ি।" আঙুল তুলে দেখায় ঝিনুক।

গাড়ির দরজা খুলে দিয়ে ভদ্রলোক বলেন, "যাক, এসে গিয়েছি। তুমি উঠে এসো গাড়িতে।"

গাড়ির নরম সিটে বসার পর চকিতে ঝিনুকের খেয়াল হয়, কাজটা কি ঠিক করলাম? এরা আমাকে অপহরণ করবে না তো?"

ভয় অমূলক। ড্রাইভার স্টিয়ারিং ঘুরিয়েছে ঝিনুকদের গেট লক্ষ করেই। দীপকাকুর সঙ্গে কাজ করে সন্দেহ করাটা বাতিক হয়ে গিয়েছে। খুবই বিনয়ের সঙ্গে ঝিনুক ভদ্রলোককে জিজ্ঞেস করে, "আপনার সঙ্গে কি বাবার অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল?"

ভদ্রলোক একটু অপ্রস্তুত হলেন। উদ্বিগ্ন হয়ে জানতে চাইলেন, "কেন, উনি কি বাড়ি নেই? আজ তো সান-ডে। আমাকে বলেছিলেন, রবিবার সকালের দিকে মোটামুটি বাড়িতেই থাকেন।"

ঝিনুক কোনও উত্তর দেয় না। আসলে আন্দাজ করতে চাইছে, ভদ্রলোকের আগমনের কারণ। বিলাসবহুল গাড়ি চেপে আজ সকালে তো কারও আসার কথা ছিল না। থাকলে বাবা বলতেন। ঝিনুককে সব কথাই বলেন বাবা।

গেটের কাছে এসে থামল গাড়ি। নেমে আসে ঝিনুক। নিজেদের বাগানে চোখ পড়তে টের পায়, শুধু বাবা নন, দীপকাকুও আছেন বাড়িতে। টগর গাছের পাশে দাঁড় করানো আছে দীপকাকুর সদ্য কেনা বাইক। অবাক হয় ঝিনুক, দীপকাকু ইদানীং রবিবারগুলোতেও আসতে পারেন না। তাঁর নাকি পসার জমে উঠেছে। একটাই দুঃখ, সেসব কেসে অ্যাসিস্ট করতে ঝিনুককে ডাকেন না।

ভদ্রলোক নেমে এসেছেন গাড়ি থেকে। বেশ ভাল হাইট। গাড়িতে বসেছিলেন বলে বোঝা যায়নি। বয়স সম্ভবত ষাটের এদিক-ওদিক। পয়সাওলা সম্ভ্রান্ত চেহারা। ঝিনুক বলে, "আসুন। বাবা বাড়িতেই আছেন।"

boierpathshala.blogspot.com

কিছুক্ষণ অন্তর দু'বার ডোরবেল টিপেও দাঁড়িয়ে থাকতে হচ্ছে ঝিনুকদের। এরকমটা তো হওয়ার কথা নয়। বাবা, দীপকাকু এখন আর দাবার বোর্ডে বুঁদ হন না। বেশিরভাগ সময় দীপকাকুর কাছে হারতে-হারতে দাবার প্রতি আগ্রহ হারিয়ে গিয়েছে বাবার। তা হলে কী নিয়ে দু'জন এত ব্যস্ত? আন্দাজ করার চেষ্টা করে ঝিনুক। মা নিশ্চয়ই কিচেনে জেদ ধরে বসে আছেন, সামনের ঘরে থাকতেও বাবা কেন দরজা খুলবেন না।

তৃতীয়বার বেল টিপতে যেতেই দরজা খুলে গেল। সামনে বাবা। ঝিনুকের পাশের ভদ্রলোকটিকে দেখে অবাক হয়েছেন।

ভদ্রলোক বলে ওঠেন, "কী হল মশাই, এর মধ্যেই ভুলে গেলেন! মনে নেই, সান্তাক্রুজ এয়ারপোর্ট। অক্টোবর মিড়ল..."

আর বলতে হল না। বাবার মুখে লজ্জা পাওয়া হাসি। বলে ওঠেন, "সরি, সরি মিস্টার ঘোষ। আপনি আসুন। ভিতরে এসে বসুন।"

দরজার পাশে জুতো খুলছেন ভদ্রলোক। ঝিনুক চটি ছেড়ে ঘরের ভিতরে আসে। এখন অবধি যা বোঝা গেল, গত অক্টোবরে অফিসের কাজে বাবা মুম্বই গিয়েছিলেন। সম্ভবত তখনই এয়ারপোর্টে মিস্টার ঘোষের সঙ্গে আলাপ। এটা জানুয়ারি মাস। এর মাঝে বাবার সঙ্গে ফোনেও কথা হয়নি ভদ্রলোকের। কোনও বিশেষ দরকারে মিস্টার ঘোষ সরাসরি বাড়িতে এসে হাজির। কিন্তু ফোন করে এলেন না কেন?

আপাতত দীপকাকুর আসার কারণটা পরিষ্কার। আগেই সেটা ধরে ফেলা উচিত ছিল ঝিনুকের। লম্বা সোফাটার কোণে বসে রুবিক কিউব নিয়ে নাড়াচাড়া করছেন দীপকাকু। বাবা দীপকাকুর সঙ্গে মিস্টার ঘোষের পরিচয় করিয়ে দিলেন। বললেন, এ হচ্ছে দীপঙ্কর। দীপঙ্কর বাগচী। আমার খুবই স্নেহভাজন, নিজের ভাইয়ের মতো। চোখ তুলে সৌজন্যের হাসি হেসে ফের রুবিক কিউবে মগ্ন হয়ে গেলেন দীপকাকু।

রুবিক কিউবটা ঝিনুকের চার বছরের বাতিল খেলনা। গত পরশু বাবা অফিস থেকে ফিরে গেমটার খোঁজ করতে শুরু করলেন। ঝিনুক বলেছিল, "কী হবে ওটা নিয়ে! ওসব আজকাল আর কেউ খেলে না। ব্যাকডেটেড হয়ে গিয়েছে।"

"হোক, তুই নিয়ে আয়। বেশিরভাগ লোক ওটা সল্‌ভ না করতে পেরে তুলে রেখে দিয়েছে। ওর মতো গেম হয় না!"

কিউবটা এনে বাবাকে দিয়েছিল ঝিনুক। এবং কী আশ্চর্য, আধঘণ্টার মধ্যে এদিক-ওদিক ঘুরিয়ে বাবা ছ'দিকে ছ'টা রং এনে দিলেন। ঝিনুকের তো চোখ বড়-বড়, এই প্রথম তার কিউবে ছ'টা রং আলাদা! মাকে দেখাতে কিউবটা নিয়ে দৌড়ল কিচেনে। মা বললেন, "আচমকা হয়ে গিয়েছে। দে, ঘেঁটে দিই।"

ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে ফের রং মিশিয়ে দিলেন মা। বাবার কাছে ফেরত এল ঝিনুক। ফের খানিকক্ষণ ঘুরিয়ে কিউবটা আগের পজিশনে এনে দিলেন বাবা। তখনই বলেছিলেন, "দীপঙ্করকে একবার ডেকে পাঠাতে হবে। দেখি, ও পারে কিনা! খুব তো বড়-বড় কেস সল্‌ভ করছে।"

সেই ডাকে সাড়া দিয়ে দীপকাকু এখন জড়িয়ে গিয়েছেন রুবিক কিউবের ধাঁধায়। বাবার অফিসে নতুন একজন জয়েন করেছে, সে বাবাকে শিখিয়ে দিয়েছে সমাধানের সূত্র।

মিস্টার ঘোষ এসে বসেছেন বাবার মুখোমুখি সোফায়। উনি তো জানেন না, বাবা-দীপকাকুর রিলেশন, যেন স্কুলের ক্লাসমেট। কম্পিটিশন, বন্ধুত্ব একসঙ্গে। সাগ্রহে কথা বলে যাচ্ছেন ঘোষবাবু। মুখে শুকনো হাসি নিয়ে বাবা হুঁ, হাঁ করতে-করতে বারেবারে তাকাচ্ছেন দীপকাকুর হাতের দিকে, সল্‌ভ করে ফেলবে কি দীপঙ্কর?

বাবা আর মিস্টার ঘোষের কথোপকথনে ঝিনুক যতটুকু উদ্ধার করল তা হচ্ছে, মুম্বই এয়ারপোর্ট থেকে কলকাতা অবধি বাবা আর মিঃ ঘোষ নানান বিষয়ে গল্প করতে-করতে এসেছেন। তার মধ্যে বাবা 'সিকিউরিটি ইদানীং কত আধুনিক হয়েছে' সেই বিষয়ে বেশ কিছু ইনফরমেশন দেন। বাবা যেহেতু সিকিউরিটি এজেন্সির মালিক এবং এক্স মিলিটারিম্যান, সুরক্ষা বিষয়ে জ্ঞান যথেষ্টরও বেশি। মিস্টার ঘোষ নামী অ্যাড এজেন্সির এক তৃতীয়াংশের মালিক। বাবার দেওয়া তথ্যগুলো গল্পের মতোই শুনেছিলেন। তখন কে জানত, আর ক'মাস পরেই বাবাকে তাঁর ভীষণ প্রয়োজন হয়ে পড়বে! বাবার দেওয়া কার্ডটাও তিনি হারিয়ে ফেলেছেন। শুধু মনে আছে, কথায়-কথায় বাবা বলেছিলেন, "মুর অ্যাভিনিউ ছেড়ে চণ্ডী ঘোষ রোডে ঢুকেই আমার বাড়ি। রবিবার সকালে মোটামুটি বাড়িতেই থাকি।"

কার্ড হারিয়ে ফেলার দরুন মিস্টার ঘোষ ফোনে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করতে পারেননি। তার জন্য ক্ষমা চেয়ে নিয়ে মিস্টার ঘোষ মানে সুজয় ঘোষ (ইতিমধ্যে পুরো নামটা জেনেছে ঝিনুক) নিজের সমস্যার কথা গুছিয়ে বলতে যাবেন, বাবা বলে উঠলেন, "ইফ ইউ ডোন্ট মাইন্ড, আপনি যদি পাঁচটা মিনিট সময় দেন, দীপঙ্কর পারে কিনা একটু দেখে নিই।"

সামান্য হকচকিয়ে গিয়ে চুপ করে গেলেন সুজয় ঘোষ। একবার ঝিনুকের দিকে তাকালেন, সামান্য রুবিক কিউব নিয়ে দুই বয়স্ক মানুষের এত মনঃসংযোগ কেন, তাঁর ঠিক বোধগম্য হচ্ছে না।

বিজ্ঞাপন কোম্পানির ডিরেকটার সুজয় ঘোষকে এরকম অসহায়ভাবে বসে থাকতে দেখে, ঝিনুকের ছেলেবেলার একটা কথা মনে পড়ে গেল, তখন ক্লাস ফোরে পড়ে ঝিনুক। এক-দু'দিন অন্তর দেওয়ালে ঠেস দিয়ে লুকিয়ে নিজের হাইট মাপত। পেনসিলে দাগ দিত মাথার উপর। বাবা ব্যাপারটা লক্ষ করেছিলেন। একদিন ধরলেন, "হ্যাঁ রে, তুই রোজ হাইট মাপিস কেন? মানুষ কি ঘণ্টায়-ঘণ্টায় বাড়ে নাকি?"

ঝিনুক অত্যন্ত সরল একটি উত্তর দিয়েছিল, "কেন, আমাকে যে মা রোজ 'সুপার মিল্ক' দেয়।"

"তাতে কী হল?" অবাক হয়ে জানতে চেয়েছিলেন বাবা।

ঝিনুক বলেছিল, "পেপারে, টিভিতে দ্যাখো না, সুপার মিল্ক খেয়ে বাচ্চারা কত তাড়াতাড়ি লম্বা, স্ট্রেংথফুল হয়ে যাচ্ছে।"

হো-হো করে হেসে উঠেছিলেন বাবা। হাসি থামিয়ে বলেছিলেন, "ও সব হচ্ছে অ্যাড এজেন্সির কেরামতি।"

"অ্যাড এজেন্সি মানে কী বাবা?" জানতে চেয়েছিল ঝিনুক।

বাবা তখন বুঝিয়ে বলেন, "এই যে চারদিকে সাইকেল, বিস্কুট, দুধ, গেঞ্জি...বিভিন্ন জিনিসের বিজ্ঞাপন দেখিস, এগুলো কোম্পানি নিজে বানায় না, একটা এজেন্সিকে বরাত দেয় নিজেদের প্রচারের। এজেন্সির কাজই হচ্ছে নানান কোম্পানির বিভিন্ন জিনিসের গুণাগুণ ফুলিয়েফাঁপিয়ে প্রচার করা। ওগুলো পুরোপুরি বিশ্বাস করা বোকামি।"

"এজেন্সিগুলো তা হলে মিথ্যেবাদী, বাবা?" বলেছিল ঝিনুক।

"না না, মিথ্যেবাদী হতে যাবে কেন? ওটাই ওদের কাজ। এই যে লেখকরা কত গল্প-কাহিনি লেখেন বানিয়ে-বানিয়ে, আমরা কি বিশ্বাস করি? জানি ওটা গল্প, অনেকটা সত্যির মতো। এজেন্সির লোকরাও সত্যির উপর কল্পনা জুড়ে দেন। খুবই বুদ্ধিমান, গুণী মানুষ ওঁরা।"

সুজয়বাবু সেই বুদ্ধিমান শ্রেণির মানুষ। দুই পরিণত মানুষের ছেলেমানুষির সামনে অনেকক্ষণ হল বোকা হয়ে বসে আছেন। ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ জমানোর মতো কথা খুঁজে পাচ্ছে না ঝিনুক।

হঠাৎই সুজয় ঘোষের দিকে না তাকিয়ে দীপকাকু বলে উঠলেন, "আপনি নিশ্চয়ই খুব বোর হচ্ছেন। ততক্ষণ নিউজপেপারটা পড়ুন না। সকালে উঠে ভাল করে কাগজটাই তো পড়া হয়নি আপনার।"

কপালে কয়েক ধাপ ভাঁজ পড়ল সুজয় ঘোষের। অবাক কৌতূহলে জানতে চাইলেন, "আপনি কী করে জানলেন, এখনও পেপার পড়িনি আমি?"

"মর্নিংওয়াকে বেরিয়ে এমন কোনও সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন, জাস্ট ড্রেসটা চেঞ্জ করে চলে এসেছেন এখানে।"

দীপকাকুর কথা শুনে মিস্টার ঘোষ গোঁজে গিয়েছেন বিস্ময়ের শেষ সীমায়। ফ্যালফ্যালে দৃষ্টিতে একবার ঝিনুক, পরের বার বাবার দিকে দেখছেন।

দীপকাকুর পর্যবেক্ষণ ক্ষমতার নমুনা বহুবার পেয়েছে ঝিনুক। তবু পুরনো লাগে না। সবচেয়ে মজা লাগে, যার উপর সেটা প্রয়োগ করা হচ্ছে, তার বোকা হয়ে যাওয়া দেখে।

boierpathshala.blogspot.com

অবাক হওয়ার প্রাথমিক ধাক্কা সামলে সুজয় ঘোষ জানতে চান, "আপনি কি জ্যোতিষ চর্চা করেন? যা যা বললেন, অক্ষরে-অক্ষরে মিলে গেল!"

বাবা, ঝিনুকের মুখে মিটিমিটি হাসি। সুজয়বাবু আবার বলেন, "আপনি নিশ্চয়ই বিখ্যাত কোনও অ্যাস্ট্রোলজার। আমি আসলে খবর রাখি না, তাই..."

দীপকাকু একই রকম সিরিয়াস। এবারও সুজয়বাবুর দিকে না তাকিয়ে বললেন, "জ্যোতিষীদের মতো অত ক্ষমতা আমার নেই। স্বচ্ছ দৃষ্টি, বুদ্ধি আর কিছুটা বিশ্লেষণ ক্ষমতা থাকলেই, যে কেউ এটা বলতে পারবে।"

"এটা আপনার বিনয়। সত্যিই বলুন না, কী করে বললেন কথাগুলো?"

উত্তর দেওয়ার খুব একটা ইচ্ছে নেই দীপকাকুর। কিউবটা নানানভাবে ঘুরিয়ে চলেছেন। চেষ্টা করছেন আপ্রাণ। দু'টো পিঠ মিলিয়ে ফেলেছিলেন। ঘেঁটে দিতে হয়েছে। ছ'টা রং মেলাতে গেলে, একবারেই করতে হবে।

এদিকে ঝিনুকের জানতে ইচ্ছে করছে, দীপকাকু কী করে এত ব্যাপার মেলালেন। বাবার অবস্থা একই। বলে ওঠেন, "ছেড়ে দাও দীপঙ্কর। তুমি পারবে না। অনেক ট্রাই করেছ। এবার আমাদের কৌতূহলটা মেটাও দেখি।"

কিউব থেকে মুখ তুললেন দীপকাকু। বললেন, "না, এখনই হাল ছাড়ছি না। তবে আপনাদের ধাঁধায় রেখে নিজের গুরুত্ব বাড়ানোটাও শোভন নয়।" একটু বিরতি নিয়ে বলতে শুরু করেন, "মিস্টার ঘোষের মোজা, তোয়ালে, কাপড়ের রং সাদা। জগিং শু'র মোজা। মর্নিং ওয়াক থেকে ফিরে মোজাটা না খুলে কালো শু পরে নিয়েছেন। হাতের ঘড়িটা ঠিক অফিসিয়াল নয়, ফোমের চওড়া ব্যান্ড, ইচ্ছেমতো স্টপওয়াচ হিসেবে ব্যবহার করা যায়। শার্ট, ট্রাউজার গতকাল অফিসে পরে গিয়েছিলেন। শার্টের ইস্তিরি নষ্ট হয়েছে, পকেটে বেশ কিছু কাগজ। টোলট্যাক্সের রিসিট দেখা যাচ্ছে। এখানে আসতে গেলে কোথাও রোডট্যাক্স দিতে হয় না। কাল ওঁকে সেকেন্ড হুগলি ব্রিজ ব্যবহার করতে হয়েছিল। অ্যাড এজেন্সির এম ডি-র এরকম অমনোযোগী পোশাকের একটাই কারণ, আচমকা কোনও উদ্বেগ। গত রাতে সব ঠিকঠাক ছিল, মর্নিং ওয়াকে বেরিয়েছিলেন। তারপরই গোলমাল। বিষয়টা অবশ্যই সুরক্ষা সম্পর্কিত, খানিকটা গোপনীয় বটে, নয়তো উনি পুলিশের কাছে যেতেন। মনে পড়েছে রজতদার কথা।"

"ব্রিলিয়ান্ট। আপনি তো একেবারে জিনিয়াস মশাই!" প্রবল আবেগে বলে উঠলেন সুজয় ঘোষ। দীপকাকুর কাছে জানতে চাইলেন, "আপনার অ্যাকচুয়াল প্রফেশনটা কী, একটু বলবেন? আপনার দাদা তো শুধু স্নেহভাজন বলেই ছেড়ে দিলেন। আপনি কি পুলিশের ইনটেলিজেন্স ব্রাঞ্চে আছেন?"

দীপকাকুর চোখ আবার রুবিক কিউবে। মোটা কাচের চশমাটা খুলে একবার রুমাল দিয়ে মুছেও নিলেন। যেন চশমার অস্পষ্টতার জন্য খেলাটা পারছেন না। বাবা বললেন, "দীপঙ্করের আসল পরিচয় পরে দিচ্ছি। এখন বলুন তো, সিকিউরিটি নিয়ে কী প্রবলেম হয়েছে আপনার? কোনও জিনিস চুরি গিয়েছে বা যাচ্ছে?"

"হ্যাঁ মশাই, মারাত্মক চুরি। পদ্ধতিটা ভীষণ জটিল। চুরিটা হয়েই চলেছে। চোরকে শনাক্ত করা যাচ্ছে না। সে একজন না অনেকজন সেটাও ধরতে পারছি না আমরা। একেবারে পথে বসিয়ে ছাড়ছে আমাদের।"

"আমাদের মানে?" জানতে চাইলেন বাবা।

দীপকাকুও একবার ঘাড় ফেরালেন এই কথায়। ঠিক তখনই পরদা সরিয়ে ঘরে ঢুকলেন মা। হাতে ট্রে। দামি কাপে চা, বড় প্লেটে স্ন্যাকস। কোন ফাঁকে দেখে নিয়েছেন, সকালের অতিথিটি অভিজাত শ্রেণির। নইলে সহজে মায়ের শখের কাপ আলমারি থেকে বেরোয় না। কাপ-ডিশ ভাঙার ব্যাপারে ঝিনুকের হাতযশ আছে। সে কারণেই ঝিনুককে না ডেকে চা-টা মা নিজেই নিয়ে এসেছেন। সেন্টার টেবিলে ট্রে নামিয়ে ঝিনুকের উদ্দেশে মা বললেন, "বাইরে থেকে এলি, যা, চেঞ্জ করে নে।"

ঝিনুক চুপ করে থাকে। মনে-মনে বলে, চেঞ্জ করার আর সুযোগ পেলাম কোথায় মা? এখানে যা সব এক্সাইটিং ব্যাপার হচ্ছে।

মায়ের সঙ্গে মিস্টার ঘোষের আলাপ করিয়ে দিলেন বাবা। ঘোষবাবু সত্যিই খুব উদ্বিগ্ন। সৌজন্যমূলক হেসে নমস্কার সারলেন। ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার আগে মা একবার তাকালেন ঝিনুকের দিকে। চোখের ভাষা পড়ে নিল ঝিনুক, 'বড়দের মধ্যে বসে কী করছ! নিজের কাজে যাও।'

কিন্তু ঝিনুককে এখন এ ঘর থেকে নড়ানো খুব মুশকিল। বাবা ফের জানতে চাইলেন, "আমাদের বলতে আপনি কী বোঝাতে চাইছেন?"

চায়ে চুমুক দিয়ে সুজয় ঘোষ বলেন, "কোম্পানির কথা বলছি।"

"কী চুরি গিয়েছে?" এই প্রশ্নটা দীপকাকুর।

"কনসেপ্ট।"

"আর-একটু ভেঙে বলুন।" এবারও দীপকাকু। বাবা উৎসাহিত হয়ে বলে ওঠেন, "তা হলে দীপঙ্কর, পারলে না তো। হার মেনে নিলে? রুবিক কিউব দাবার চেয়েও কঠিন।"

"হ্যাঁ রজতদা। মেনে নিলাম।"

বাবার চোখে-মুখে ছোটদের মতো জেতার আনন্দ। বলেন, "দ্যাখ ঝিনুক, তোর গুরুকে কেমন কাত করে দিলাম।"

এই সিচুয়েশনে ঝিনুকের মিশ্র প্রতিক্রিয়া হয়। বাবা জিতলে আনন্দ, দীপকাকু হারলে দুঃখ। সে যে ঠিক কার সাপোর্টার বুঝে উঠতে পারে না। তবে এই মুহূর্তে দীপকাকুর হার স্বীকার করে নেওয়ার কারণ যে মিস্টার ঘোষের সমস্যা, সেটা বোঝা খুব সোজা।

বাবার দিকে তাকিয়ে ঘোষবাবু বলতে শুরু করেছেন, "ঠিক করেছিলাম আপনার সঙ্গে দেখা করতে আসা এবং আলোচনাটা সিক্রেট রাখব। কিন্তু আপনার স্নেহভাজনের সঙ্গে কথা বলে মনে হচ্ছে, উনিও আমাকে হেল্প করতে পারেন।"

"অবশ্যই পারবে। আপনি বলুন।" সায় দিলেন বাবা।

"আমাদের এজেন্সির নাম 'অ্যারো'। শুনেছেন নিশ্চয়ই?"

"শুনেছি। লাস্ট কয়েক বছরের মধ্যে আপনাদের এজেন্সি বিজ্ঞাপন দুনিয়ায় উপরের সারিতে উঠে এসেছে।" বললেন দীপকাকু।

ঝিনুকের অত ফান্ডা নেই, সে শুধু শুনে যাচ্ছে। মিস্টার ঘোষ বলতে থাকেন, "এখন থেকে পনেরো বছর আগে আমরা তিনবন্ধু মিলে এজেন্সিটা খুলি। তার আগে আমরা তিনজনেই ভিন্ন কোম্পানির উঁচু পদে চাকরি করেছি। হঠাৎ মনে হয়েছিল, আর চাকরি নয়, স্বাধীনভাবে কিছু করা যাক।"

"আপনাদের বন্ধুত্ব কত দিনের?" কথার মাঝে জানতে চাইলেন দীপকাকু।

"স্কুলবেলার বন্ধু আমরা। আমি আর গৌতম এক পাড়ায় থাকি। পাশের পাড়ায় পার্থ। ছেলেবেলায় একসঙ্গে খেলাধুলো করেছি, কত দুষ্টুমি করেছি। জমাটি বন্ধুত্ব ছিল আমাদের।" বলতে-বলতে অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছিলেন সুজয়বাবু।

"তারপর?" বলে দীপকাকু খেই ধরিয়ে দিলেন।

"গোড়ায় এজেন্সিটা দাঁড় করাতে আমাদের প্রচুর পরিশ্রম করতে হয়েছে। কোম্পানিটা দাঁড়িয়ে যাওয়ার প্রধান কারণটাই কিন্তু হচ্ছে আমাদের গভীর বন্ধুত্ব এবং পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস। বেশ কয়েক মাস ধরে আমাদের কোম্পানি পড়েছে বিচ্ছিরি সমস্যায়। নিজেদের মধ্যে বিশ্বাসটাতেই ফাটল ধরে যাচ্ছে।" একটু দম নিয়ে সুজয় ঘোষ বলতে থাকেন, "আপনারা হয়তো জানেন, অ্যাড এজেন্সির সবচেয়ে বড় সমস্যা 'কনসেপ্ট' চুরি হয়ে যাওয়া। ধরুন, কোনও একটা প্রোডাক্টের বিজ্ঞাপন তৈরি করলাম আমরা, মানে ড্রয়িং, স্লোগান, কাস্টমারকে দু'-চারটে নমুনা দেখালাম। একটা অ্যাপ্রুভড হল। দেখা যাচ্ছে, আমরা পাবলিশ করার আগেই, আমাদের কাস্টমারের প্রতিযোগী সংস্থা প্রায় সেই ডিজাইন, স্লোগান নিয়ে তাদের প্রোডাক্টের বিজ্ঞাপন মার্কেটে ছড়িয়ে দিয়েছে। পুরনো কাস্টমারের কাছে হেনস্থার একশেষ হচ্ছি

boierpathshala.blogspot.com

আমরা। তারা কাজ দেওয়া বন্ধ করে দিচ্ছে।"

"চুরিটা আটকাতে পারছেন না কেন? এ তো খুব সোজা, আপনাদের কোনও স্টাফ ভিতরের খবর বাইরে পাচার করে দিচ্ছে।" বললেন বাবা।

মিস্টার ঘোষ বলেন, "না মশাই। আমরাও প্রথম-প্রথম তাই ভাবতাম। সেই কারণে আর্টিস্ট, কপি রাইটারদের দিয়ে চার-পাঁচরকম স্যাম্পেল করালেও, কাস্টমার কোনটা পছন্দ করছে জানতে দিতাম না। জানতাম আমরা তিনজন। প্রচারের উদ্যোগ নেওয়ার আগেই দেখি, কাগজে, হোর্ডিংয়ে আমাদের আইডিয়া নিয়ে অন্য কোম্পানির প্রোডাক্ট জ্বলজ্বল করছে। যেমন, আজ সকালে মর্নিং ওয়াকে বেরিয়ে দেখি, দু'দিন পর যে পোস্টার আমাদের সাঁটার কথা, সেটা অন্য এজেন্সি সেঁটে দিয়ে গিয়েছে। এবারের চুরিটা আরও ন্যাক্কারজনক, নীতিহীন। চোরেদেরও তো একটা নীতি থাকে। এদের সেটাও নেই।"

"ঘটনাটা সবিস্তার বলুন।" আগ্রহী কণ্ঠে বলেন দীপকাকু।

"ব্যাপারটা হয়েছে কী, একটা প্রোডাক্টের অ্যাড আমরা দু'ধাপে করব প্ল্যান করেছিলাম। এই পদ্ধতি আগেও অনেকবার ব্যবহার হয়েছে। আপনারা হয়তো লক্ষ করেছেন, কিছুদিন ধরে কলকাতার দেওয়ালে একটা পোস্টার ছেয়ে গিয়েছে, কালো কাগজের উপর হলুদ লেটারিং 'সময়ের দাম কমে গেল'।"

ঝিনুক উত্তেজিত হয়ে বলে ওঠে, "হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি দেখেছি। কীসের অ্যাড বলুন তো ওটা?"

"সেটাই হল কথা। এই প্রশ্নটাই আমরা পাবলিকের মনে ঢুকিয়ে দিতে চেয়েছিলাম। দু'সপ্তাহ ধরে প্রশ্নটা মাথায় নিয়ে ঘুরবে লোকে। তারপর সেই পোস্টারের পাশেই পড়বে নতুন পোস্টার, 'রিদ্‌ম ঘড়ির দাম এখন মাত্র একশো টাকা।"

"দারুণ আইডিয়া।" বলে উঠল ঝিনুক।

একটুও উৎসাহিত হলেন না সুজয় ঘোষ। বিষণ্ণ গলায় বললেন, "আজ হাঁটতে বেরিয়ে দেখি, আমাদের প্রথম পোস্টারের পাশে সাঁটা রয়েছে 'প্লাজা ঘড়ির দাম এখন মাত্র একশো টাকা'।

ঝিনুক, দীপকাকু হতবাক হয়ে গিয়েছেন। বাবা বলে উঠলেন, "মাই গড। চুরি তো ওরা করেইছে, নিজেদের বিজ্ঞাপনের খরচার হাফ আপনাদের ঘাড় থেকে তুলে নিল। সত্যিই এটা খুবই নোংরা অ্যাটিটিউড।"

আলোচনা চলাকালীন যে যার চা শেষ করেছেন। তবু নিজের ফাঁকা কাপের দিকে তাকালেন সুজয়বাবু। এতক্ষণ কথা বলে গলা শুকিয়ে গিয়েছে হয়তো। ফের নিজের থেকেই বলতে শুরু করলেন, "এর আগে পাঁচবার আমাদের কনসেপ্ট চুরি করেছে। সেটাকে তবু বিজনেসের অঙ্গ হিসেবে ধরে নিয়েছিলাম। কিন্তু এবার যা করল, পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, আমাদের ব্যবসা তুলে দেওয়াই ওদের মূল লক্ষ্য।"

"ওদের বলতে? আপনাদের আইডিয়া কি বিভিন্ন এজেন্সি চুরি করছে, কোনও একটি এজেন্সি নয়?" অনেকক্ষণ চুপ থাকার পর প্রশ্ন করলেন দীপকাকু।

"ঠিক তাই। সেই জন্যই তো কম্পিটিটরদের মূল অপরাধী হিসেবে ভাবতে পারছি না আমরা। আসল অপরাধী একজন। যে অন্য এজেন্সিগুলোকে আমাদের কনসেপ্ট বিক্রি করে দিচ্ছে। সেই পাজাটি কে? হিসেবমতো আমাদের তিন পার্টনারের মধ্যে একজন। রিদ্‌ম ঘড়ির অ্যাড সিক্রেট শুধু আমরাই জানতাম। বারবার কনসেপ্ট চুরি হয়ে যাচ্ছে দেখে, টোটাল কাজটা অফিসের কাউকে দিয়ে করাইনি। বাইরে বিভিন্ন জায়গায় অংশবিশেষের কাজ করিয়েছিলাম।"

"এই সমস্যায় আপনার হঠাৎ রজতদার কথা মনে পড়ল কেন?" জানতে চাইলেন দীপকাকু।

উত্তর দেওয়ার বদলে ঝিনুকের দিকে তাকালেন মিস্টার ঘোষ। অতি বিনয়ে বললেন, "আর-এক কাপ চা হলে বড় ভাল হয়।"

আলোচনার একটা অংশও মিস করতে চায় না ঝিনুক, সিনেমায় যেমন ছবি হঠাৎ ফাস্ট করে এফেক্ট আনা হয়, সেইভাবেই মাকে চায়ের কথা বলে এসে বাবার পাশের টুলে বসে পড়ল ঝিনুক। সুজয় ঘোষ বলে যাচ্ছেন, "আজকের কীর্তি দেখে তো মাথায় বজ্রাঘাত। প্রথমেই ভাবলাম পার্টনারদের ফোন করি। সেলফোন ছিল সঙ্গে। পরমুহূর্তে ভাবলাম, ঘুম ভাঙিয়ে ওদের খারাপ খবরটা দেওয়ার কোনও মানে হয় না। আবার আর-একটা কথাও মনে হল, কালপ্রিট তো ওই দু'জনের মধ্যেই একজন। আমার উৎকণ্ঠায় সে খুব মজা পাবে। সেটাই বা তাকে পেতে দেব কেন? এদিকে টেনশনটা একা সহ্য করাও মুশকিল। হার্টের অসুখ আছে আমার। পেসমেকার বসানো হয়েছে। কী করি ভেবে পাচ্ছি না। পুলিশ, কোর্ট ভাবতে-ভাবতে মাথায় এল, এটা তো প্রাইভেসি লিক আউট হয়ে যাওয়ার ঘটনা। নিরাপত্তার জন্য কিছু করতে হবে। মনে পড়ল মিস্টার সেনকে। ওঁর সঙ্গে আলাপ হতেই মনে হয়েছিল, ভীষণ নির্ভরযোগ্য মানুষ। তাই সরাসরি চলে এলাম।"

ঘরের চারজনই এখন একদম চুপ। ওয়াল ক্লকের মৃদু কিচকিচ শব্দটা শুধু শোনা যাচ্ছে। ব্যাটারিচালিত ঘড়ি। ঝিনুক ঘড়িটার দিকে তাকায়, অবাক হয়, খেয়ালই ছিল না তাদের ঘড়িটা 'রিদ্‌ম' কোম্পানিরই। এদেরই বিজ্ঞাপনের বরাত পেয়েছিলেন মিস্টার ঘোষ। কিচকিচ শব্দটা ছিঁচ ছিঁচ শোনায় ঝিনুকের কাছে, যেন ভর্ৎসনা করছে সুজয় ঘোষকে।

বাবা শুরু করলেন কথা, "দেখুন মিস্টার ঘোষ, আপনার সমস্যায় আমি কতটা হেল্প করতে পারব জানি না। তবে আমার এই ভাইটিকে যদি দায়িত্ব দেন, আশা করি প্রবলেমটা সল্‌ভ করে দেবে।"

ব্যাপারটা ঠিক বুঝে উঠতে পারলেন না সুজয়বাবু। অবাক হয়ে তাকালেন দীপকাকুর দিকে। বাবা ফের বলেন, "আলাপ করিয়ে দেওয়ার সময় দীপঙ্করের আসল পরিচয়টা আপনাকে আমি দিইনি। দীপঙ্করের বারণ আছে। খুব প্রয়োজন ছাড়া ওর পরিচয় কাউকে দেওয়া যাবে না। আপনার ক্ষেত্রে দরকার হয়ে পড়েছে। দীপঙ্কর একজন প্রাইভেট ডিটেকটিভ। বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ কেস ইতিমধ্যে সল্‌ভ করেছে, নামটামও বেরিয়েছে কাগজে।"

কথা কেড়ে নিয়ে সুজয় ঘোষ বলেন, "ভালই হল, উনিই কেসটার দায়িত্ব নিন।"

এবার দীপকাকুর দিকে তাকালেন মিস্টার ঘোষ। বললেন, "কি, নিচ্ছেন তো?"

দীপকাকু নীরব। ঝিনুকের অস্বস্তি বাড়ছে, কেন এখনও 'হ্যাঁ' বলছেন না দীপকাকু। আর-একটা ব্যাপার খারাপ লেগেছে ঝিনুকের। দীপকাকুর পরিচয় দেওয়ার সময় বাবা কেন অ্যাসিস্ট্যান্টের পরিচয়টা দিলেন না।

দীপকাকু চুপ করে থাকার মানেটা করে নিতে দেরি হল না সুজয় ঘোষের। যতই হোক, ব্যবসায়ী মানুষ। বলেন, "আপনার অ্যাডভান্স অ্যামাউন্ট যদি বলেন, আজই চেক রেডি করে দিতে পারি। ইনফ্যাক্ট, চেক বই থাকলে এখনই করে দিতাম।"

"সাড়ে এগারো হাজার টাকা।" বললেন দীপকাকু।

এরকম খটমট অ্যামাউন্ট শুনে ঘরের বাকি তিনজনের ভ্রু কুঁচকে গেল। অ্যাডভান্স চাওয়ার ধরনটাও ঝিনুকের বেশ খারাপ লেগেছে। সুজয় ঘোষ খুব তাড়াতাড়ি নিজেকে স্বাভাবিক করে নিয়ে জানতে চাইলেন, "চেকটা তা হলে আপনার অ্যাড্রেসে আজ পাঠিয়ে দিচ্ছি। ঠিকানাটা যদি একটু বলেন।"

"আজ দরকার নেই। আমি কাল আপনাদের অফিসে যাব, তখনই দেবেন।" বলে একটু থামলেন দীপকাকু। কী একটু চিন্তা করে নিয়ে বললেন, "আমাকে তদন্তের ভার দিলেন, এটা কি আপনার পার্টনারদের বলবেন?"

"অবশ্যই বলব। আপনাকে তদন্তের দায়িত্ব দিচ্ছে কোম্পানি। আমি নই। কেননা, আমি বাকি দুই বন্ধুর কাছে বিশ্বস্ত থাকতে চাই। কোনও কিছুই লুকিয়ে করব না।"

"ফাইন। এবার আপনার একটা পার্সোনাল কার্ড দিন আমাকে।" বললেন দীপকাকু।

"ও, শিওর!" বলে পার্স বের করলেন মিস্টার ঘোষ। ঝিনুকের

boierpathshala.blogspot.com

খেয়াল হয়, ভদ্রলোক অনেকক্ষণ হল চা চেয়েছেন। কিচেনের উদ্দেশে উঠে যায় ঝিনুক।

মায়ের থেকে চা নেওয়ার সময় শুনতে পায়, বসার ঘরে কারও সেলফোন বাজছে। রিংটোন অচেনা। সম্ভবত সুজয় ঘোষের।

চায়ের ট্রে নিয়ে বসার ঘরে এসে ঝিনুক দ্যাখে, তিনজনের জায়গায় দু'জন। সুজয় ঘোষ নেই।

"কোথায় গেলেন?" বাবা, দীপকাকুর কাছে জানতে চায় ঝিনুক।

বাবা বলেন, "এক পার্টনারের ফোন এসেছিল, তাঁর চোখেও পড়েছে পোস্টারিংয়ের বদমাইশি। তিন পার্টনার এক্ষুনি মিটিং-এ বসবেন। তাই বেরিয়ে গেলেন।"

"ইস, চা খেতে চাইলেন, দেরি হয়ে গেল!" আপশোস করে ঝিনুক। টেবিলে ট্রে'টা নামিয়ে রাখতে না-রাখতেই দীপকাকু একটা কাপ তুলে নিয়ে গভীর চিন্তায় ডুবে গেলেন। বাবা অনেক রিলাক্সড। কেস চলে গিয়েছে দীপকাকুর জিম্মায়। হাসিহাসি মুখ করে দীপকাকুকে জিজ্ঞেস করলেন, "আচ্ছা, তুমি ওরকম সাড়ে টাইপের অ্যাডভান্স চাইলে কেন?"

প্রশ্নটা ঝিনুকেরও, তাকিয়ে থাকে দীপকাকুর দিকে। চায়ে চুমুক দিয়ে দীপকাকু বলেন, "মোটরবাইকের শেষ কিস্তিটা দেওয়া বাকি আছে। কালই চিঠি পাঠিয়েছে ডিলার। ঠিক সাড়ে এগারো হাজার টাকাই ডিউ আছে। ভাবলাম, দেনাটা মিটিয়েই ফেলি।"

ঝিনুক তো অবাক। বলে, "আর আমরা যদি কেসটা সল্‌ভ না করতে পারি, তখন তো ফেরত দিতে হবে টাকাটা?"

"দেবে। পরবর্তী যে কেসটা আসবে, তার থেকে অ্যাডভান্স নিয়ে দিয়ে দেবে।" ব্যঙ্গের সুরে কথাটা বললেন বাবা। দীপকাকু হাসছেন। ঝিনুক কিন্তু গম্ভীর। খুবই চিন্তিত মুখে দীপকাকুকে জিজ্ঞেস করে, "আপনার কী মনে হচ্ছে কেসটা খুব ইজি, সহজেই সল্‌ভ করে ফেলব আমরা?"

"তদন্তে এখনও নামিনি, টাফ না ইজি বলা কঠিন। তবে তোমার শেষ দু'টো প্রশ্নে 'আমরা' শব্দটা খেয়াল করলাম। মনে হচ্ছে এই কেসে তুমি আমার পিছু ছাড়বে না।"

ঝিনুক একটু অপ্রস্তুত হয়ে পড়ে। সত্যিই সে বুদ্ধি করে 'আমরা' কথাটা বলে টেস্ট করছিল। মানুষটা সর্বদাই ভীষণ সজাগ। ঝিনুকের দোষ নেই, দীপকাকু সব ধরনের কেসে তাকে নেন না। কিছু-কিছু কাজের পরিবেশ, পরিস্থিতি, মানুষ, নাকি খুবই খারাপ। যত দূর আন্দাজ করা যাচ্ছে, এই কেসটা তেমন হবে না। ঝিনুকের মনের কথাটাই বলে ওঠেন বাবা, "এই তদন্তে ঝিনুককে তোমার সঙ্গে নেওয়া উচিত দীপঙ্কর। অ্যাড ওয়ার্ল্ড সম্বন্ধে ওর একটা ধারণা তৈরি হবে।"

নির্বিকারভাবে বসে আছেন দীপকাকু। পুরু ঘোলাটে চশমার আড়ালে চোখের ভাষা পড়া যাচ্ছে না। হঠাৎই সোফা ছেড়ে উঠে পড়ে বলেন, "ঠিক আছে, সকাল দশটায় রেডি থেকো। সুজয় ঘোষের অফিসে যাব।"

ঝিনুক স্বাভাবিক কারণেই খুব খুশি। বাবা বলেন, "সে কী, এখনই চললে!"

"হ্যাঁ, রজতদা। কেসটা বেশ ক্রিটিক্যাল মনে হচ্ছে। এখন থেকেই কাজ শুরু করে দিতে হবে।" বলেন দীপকাকু।

"কোথা থেকে শুরু করবে কাজ?"

"প্রথমে যাব পোস্টারগুলো দেখতে। মিস্টার ঘোষের 'অ্যারো' কোম্পানির সম্বন্ধে ডিটেলে খোঁজখবর নেব। যে এজেন্সি প্লাজা ঘড়ির অ্যাড অ্যারো এজেন্সির পোস্টারের পাশে সেঁটেছে, তাদের ব্যাপারেও খোঁজ নিতে হবে।" কথা বলতে-বলতে দরজা পেরিয়ে গেলেন দীপকাকু। খানিক পরেই বাইরে বাইক স্টার্টের আওয়াজ পাওয়া গেল।

দীপকাকুর অ্যাডভান্স চাওয়ার ধরন তখন ভাল লাগেনি ঝিনুকের, চেক হাতে আসার আগেই দীপকাকুকে কাজে নেমে পড়তে দেখে, এখন মনে-মনে 'সরি' চেয়ে নেয়।

ঝিনুকও আপাতত কিছু হোমওয়ার্ক করে নেবে। ম্যাগাজিনের বিজ্ঞাপনের পাতাগুলো এতদিন এড়িয়ে যেত। আজ দেখবে খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে, ক্যাপশন, ডিজাইন, এজেন্সির নাম, মোটামুটি একটা ধারণা তৈরি করতে হবে। রহস্য যে কখন কোন বিষয়ে পাকিয়ে ওঠে, বোঝা মুশকিল।

॥ ২ ॥

এই প্রথম কোনও অ্যাড এজেন্সির অফিসে এল ঝিনুক। দীপকাকুর সঙ্গে বসে আছে ভিজিটর্স সোফায়। সামনে রিসেপশন কাউন্টারে সুন্দরী এক মহিলা। কিছুক্ষণ অন্তর ফোন বাজছে। রিসিভার তুলে মিষ্টি করে কথা বলছেন রিসেপশনিস্ট। ইতিমধ্যে বেশ কয়েকজন কাউন্টারে এল, কাউকে ভিতরে পাঠালেন, কারও কাজ এখানেই সমাধা হল। ঝিনুকরা বসে আছে মহিলার যেন খেয়াল নেই।

এখানে ঢুকে দীপকাকু কাউন্টারে গিয়ে নিজের নাম আর সুজয় ঘোষের সঙ্গে দেখা করতে চান, বলেছেন। ঝিনুক লক্ষ করেছে, দীপকাকু নিজের কার্ড রিসেপশনে দেননি। অর্থাৎ অফিস স্টাফের কাছে পরিচয় গোপন রাখতে চান।

ইন্টারকমে মহিলা খবর পাঠালেন ভিতরে। ওপারের নির্দেশ শুনে অপেক্ষা করতে বললেন ঝিনুকদের। তা প্রায় মিনিট কুড়ি হতে চলল, এখনও ডাক আসেনি। ক্রমশ ধৈর্য হারাচ্ছে ঝিনুক। বিপদ থেকে বাঁচার জন্য সুজয় ঘোষ কীরকম আকুল হয়ে ঝিনুকদের বাড়ি গিয়েছিলেন, এখন বসিয়ে রেখেছেন বাইরে। সমস্যা কি নিজেরাই খানিকটা সল্‌ভ করে ফেললেন?

কাল রাতে হোমওয়ার্কে বেশ খাটুনি গিয়েছে ঝিনুকের। ম্যাগাজিনের অ্যাডগুলোর নীচে খুদি-খুদি অক্ষরে লেখা থাকে যে এজেন্সি বিজ্ঞাপন তৈরি করেছে তার নাম। চোখ ব্যথা হয়ে গিয়েছে পড়তে। কয়েকটা অতি পরিচিত বড়সড় বিজ্ঞাপনের তলায় অ্যারো কোম্পানির নামও দেখেছে ঝিনুক। তাতেই আন্দাজ করা গিয়েছে ঘোষবাবুদের কোম্পানি উঁচু তলার। অফিসে এসে সেটা আরও টের পাওয়া যাচ্ছে। সেন্ট্রালি এসি। ছোট-ছোট কিউবিক্‌ল। অধিকাংশ স্টাফ ইয়ং, ওয়েল ড্রেসড। মন দিয়ে যে যার কাজ করে যাচ্ছে। গতকালই যে কোম্পানি বড় একটা ধাক্কা খেয়েছে, এদের আচরণে তার কোনও ছাপ নেই। ভাবনা এখানে এসে হোঁচট খায় ঝিনুকের, এরা হয়তো জানেই না ঘটনাটা। সুজয় ঘোষ বলেছিলেন, 'রিদ্‌ম' ঘড়ির অ্যাড প্ল্যান তিন পার্টনার মিলে করেছিলেন। ডিজাইন, ছাপার কাজ বাইরে বিভিন্ন জায়গা থেকে করানো হয়। তা সত্ত্বেও খবর চলে গেল অন্য এজেন্সিতে। তা হলে কি তিন পার্টনারের মধ্যে একজন বিশ্বাসঘাতক লুকিয়ে আছে? কেসটা অত্যন্ত আকর্ষক এবং উত্তেজক তাতে কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু দীপকাকু কেমন যেন একটু চুপচাপ, ধ্যানস্থ হয়ে আছেন। আড়চোখে একবার দীপকাকুকে দেখে নেয় ঝিনুক, ঘাড় একটু হেলিয়ে শূন্যে দৃষ্টি রেখে বসে আছেন। মোটা কাচের চশমায় প্রতিফলিত হয়েছে অফিসের উজ্জ্বল আলো। কী যে দেখছেন, ভাবছেন, বোঝা যাচ্ছে না।

গতকাল দুপুর থেকে এখন পর্যন্ত প্রাথমিকভাবে কেসটা নিয়ে কী কী কাজ করেছেন দীপকাকু, ডিটেলে বলেননি ঝিনুককে।

ঠিক দশটার সময় বাড়ির গেটের সামনে দাঁড়িয়ে ছিল ঝিনুক। মিনিট পাঁচেকের মধ্যে দীপকাকু বাইকে চেপে আসেন, পিছনে বসে ক্যামাক স্ট্রিটের এই অফিসে এসেছে ঝিনুক। টালিগঞ্জ থেকে এতটা পথে দীপকাকুর সঙ্গে কথা হয়েছে একবারই। ঝিনুক জানতে চেয়েছিল, "পোস্টারের বদমাইশি যে এজেন্সি করেছে, নাম কী?"

বাইক চালাতে-চালাতে দীপকাকু বলেছেন, "রূপরেখা।"

গত কালই নামটার সঙ্গে পরিচয় হয়েছে। ম্যাগাজিনের অ্যাডের নীচে দেখেছে ঝিনুক। এরাও নামীদামি প্রোডাক্টের বিজ্ঞাপন করে। তার মানে দু'টো বড় বিজনেস হাউসের মধ্যে লড়াই। একটু পরে ঝিনুক ফের বলেছিল, "এখনও তো একটাও পোস্টার চোখে পড়ল না!"

উত্তর দেননি দীপকাকু। দেশপ্রিয় পার্কের কাছে পৌঁছতেই

boierpathshala.blogspot.com

আশপাশের দেওয়ালে, গুমটি দোকানের গায়ে দেখা গেল সেই দু'টো পোস্টার। একটায় 'সময়ের দাম কমে গেল'। পাশেই একই রকম কাগজে 'প্লাজা ঘড়ির দাম এখন মাত্র একশো টাকা'। বোঝার উপায় নেই কত বড় অন্যায় লুকিয়ে আছে ওই প্রচার-পদ্ধতিতে।

"মিস্টার বাগচী, প্লিজ গো ইনসাইড।"

রিসেপশনিস্ট মহিলার ডাকে চিন্তা থেকে ফেরে ঝিনুক। সেকেন্ডখানেক আগে ফোন বেজেছিল রিসেপশন ডেস্কে, সম্ভবত ওটাই ছিল ঝিনুকদের ভিতরে যাওয়ার পারমিশন।

সোফা ছেড়ে উঠে গিয়েছেন দীপকাকু। ঝিনুক অনুসরণ করে। বাধা দিলেন রিসেপশনিস্ট, "সরি মিস্টার বাগচী। শুধু আপনি যেতে পারবেন ভিতরে। আপনার কথাই বলেছি আমি।"

বিরক্তিতে ভ্রূ কুঁচকে গিয়েছে ঝিনুকের। দীপকাকু বলেন, "না, ও যাবে আমার সঙ্গে। প্রয়োজন আছে।"

"তা হলে যে আবার পারমিশন নিতে হয়!" বলে ইন্টারকমের রিসিভার তুলতে যাচ্ছিলেন মহিলা, ফোনসেট বেজে ওঠে। রিসিভার কানে নিয়ে ও প্রান্তের কথা শুনে মহিলা বলেন, "ঠিক আছে, আপনারা দু'জনেই যান।"

ঝিনুক অবাক হয়ে দীপকাকুর দিকে তাকায়। চোখের ইশারায় দীপকাকু ঘরের কোণে উপরের দিকটা দেখান। সেখানে ছোট্ট ক্যামেরা, ঘাড়নাড়া পুতুলের মতো এদিক-ওদিক করছে।

মুহূর্তে বিষয়টা বুঝে নেয় ঝিনুক। এই ক্লোজড সার্কিট ক্যামেরার মাধ্যমেই ভিতরের মানুষটি ঝিনুকদের সমস্যাটা দেখতে পেয়েছেন।

অফিস হলের শেষ প্রান্তে এম ডি-র চেম্বার। নক করে ভিতরে ঢোকেন ঝিনুক, দীপকাকু। বিশাল সেক্রেটেরিয়েট টেবিলের ওপারে বসে আছেন তিন সমবয়সি। সুজয় ঘোষ উঠে দাঁড়ালেন, "সরি মিস্টার বাগচী, আপনাদের অনেকক্ষণ বসিয়ে রাখলাম। আসলে এরা দু'জন অন্য কাজে বিজি ছিল। দেরি হয়ে গেল তিনজন একসঙ্গে হতে।"

"ইটস্ অল রাইট।" বলে দীপকাকু চেয়ার টেনে বসলেন। ঝিনুক বসে পাশের চেয়ারে। সুজয় ঘোষ তাঁর দুই পার্টনার পার্থ বর্মন, গৌতম মজুমদারের সঙ্গে দীপকাকুর আলাপ করিয়ে দেন। হ্যান্ডশেকের পর দীপকাকু "আমার অ্যাসিস্ট্যান্ট," বলে ঝিনুকের পরিচয় দিলেন। কুণ্ঠিত নমস্কার বিনিময় করে ঝিনুক। অন্য সময় এই পরিচয়ে গর্বিত হত, ঝা-চকচকে অফিস, রাশভারী মানুষগুলোর সামনে কেমন যেন নার্ভাস লাগছে।

সুজয়বাবু টেবিলের উপর থেকে একটা খাম তুলে দীপকাকুর দিকে এগিয়ে ধরে বললেন, "আপনার অ্যাডভান্সটা। টোটাল কত লাগবে যদি একটু বলেন?"

"পঁচিশ মতো। ট্রাভেলিং ও অন্যান্য এক্সপেন্স বাদ দিয়ে।" বলে খামটা পকেটে চালান করলেন দীপকাকু। ঝিনুক সন্তর্পণে পার্থ আর গৌতমবাবুকে দেখে নেয়। যা ভেবেছিল তাই, ওঁরা যেন ঠিক ভরসা করতে পারছেন না দীপকাকুকে। কারণটা দীপকাকুর গেট-আপ। নিরীহ ভালমানুষ টাইপের চেহারা। পোশাকও তথৈবচ। ঝিনুক জানে, এটা দীপকাকুর মোড়ক, আড়ালে থাকা তীক্ষ্ণ বুদ্ধি এবং হাড্ডেড পারসেন্ট ফিট স্পোর্টসম্যানটির পরিচয় ঝিনুক আগের তদন্তগুলোতে প্রত্যক্ষ করেছে।

দীপকাকু জিজ্ঞাসাবাদে চলে গিয়েছেন, "পোস্টারিংয়ের ব্যাপারটা

boierpathshala.blogspot.com

দেখছি রূপরেখা এজেন্সি করেছে। আগে কোনও শত্রুতা ছিল আপনাদের সঙ্গে?"

"না মশাই। বিজনেসে যেমন সুস্থ প্রতিযোগিতা থাকে, তেমনটাই ছিল। কিন্তু এই ঘটনাটা যা করল, আমরা খুব অবাক হয়েছি।" বললেন সুজয় ঘোষ।

"ওদের সঙ্গে কথা বলেছেন?"

"প্রবৃত্তি হয়নি।"

"এরকম চিটিং আর কোন-কোন এজেন্সি করেছে?"

"তিনটে এজেন্সি। তার মধ্যে একটা এজেন্সি আমাদের এক বন্ধুর। ছোট এজেন্সি। পরে অবশ্য সে আমাদের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিয়েছে। বলেছে, এরকম ঘটনা আর ঘটবে না।"

এই পয়েন্টটা দীপকাকুর বাড়তি মনোযোগ আদায় করে নেয়। জিজ্ঞেস করেন, "বন্ধুটি কনসেপ্ট হাতিয়ে ছিলেন কীভাবে?"

এবার উত্তর দেওয়ার জন্য নড়েচড়ে বসেন পার্থ বর্মন। বলেন, "অজিত মানে আমাদের বন্ধুর ভার্সান, কেউ একজন ফোন করে কনসেপ্টটা ওকে বলে। ওটা যে আমাদের অ্যাপ্রুভ হয়ে যাওয়া অ্যাড কপি, সেটা বলেনি। ঘটনাচক্রে আমাদের আগেই অজিত নকল অ্যাডটা পাবলিশ করে ফ্যালে।"

"ফোন যে করেছিল, টাকা চায়নি?"

"অবশ্যই চেয়েছিল। অজিত তার চাহিদাও মেটায়। তবে টাকা সে ফোনের লোকটার হাতে দেয়নি। নির্দেশমতো পার্কের বেঞ্চে রেখে এসেছিল।"এটা বললেন গৌতম।

খানিক চুপ করে থেকে দীপকাকু জানতে চান, "অজিতবাবুর এজেন্সির নাম কী?"

"'চিত্রা'। ওর স্ত্রীর নামে এজেন্সির নাম। ওর স্ত্রীই কোম্পানি চালায়। ও টুকটাক দেখাশোনা করে। অজিত ডাক্তার। একটা নার্সিংহোম আছে?" বললেন সুজয়বাবু।

দীপকাকু পরের প্রশ্নে যান, "বাকি দু'টো এজেন্সির নাম বলুন।"

"'লোটাস' আর 'আর্টলাইন'। এই দু'টো এজেন্সি বরাবর আমাদের সঙ্গে টক্কর নেয়।" বললেন গৌতম।

দীপকাকু এবার পুরোপুরি মৌন হয়ে গেলেন। ভ্রু কুঁচকে কী যেন ভাবছেন। চেম্বারের চারপাশে চোখ বোলায় ঝিনুক। সুন্দর ইন্টিরিয়র। বাঁ পাশের দেওয়ালে ফ্লিক টেলিভিশন। ঘরের এক কোণে কম্পিউটার ডেস্ক। তারপরই দেওয়ালে গাঁথা একটা সিন্দুক। যার হ্যান্ডেলটা জাহাজের স্টিয়ারিংয়ের মতো। শেল্‌ফে ম্যাগাজিন, বইগুলো সুন্দর করে সাজিয়ে রাখা। তাকের ফাঁকা জায়গায় কিউট শো পিস। দৃষ্টি থামে তিন পার্টনারের পিছনের দেওয়ালে। বেশ বড়সড় ডিসপ্লে বোর্ড। সেখানে পিন আটকানো এঁদের কোম্পানির নানান বিজ্ঞাপনের কাটিং। একটা ছবিতে এসে হোঁচট খায় ঝিনুক। পরিচ্ছন্ন চকচকে রাস্তায় ব্লেসিং গাউন পরা একটা লোক আধশোয়া হয়ে বই পড়ছে। রাস্তার দু'পাশে ছিমছাম কটেজ, ফ্ল্যাটবাড়ি, পার্ক, সুইমিং পুল... এরকমই একটা বিজ্ঞাপন ম্যাগাজিনের পাতায় দেখেছে ঝিনুক। কিন্তু এটা নয়।

সপ্রশ্ন দৃষ্টি নামিয়ে সুজয়বাবুর দিকে তাকায় ঝিনুক। ভদ্রলোক নীরব হাসছেন। বড় মলিন হাসি। বলেন, "এই অ্যাডটা চেনা-চেনা লাগছে, তাই না?"

ঝিনুক ঘাড় হেলিয়ে সম্মতি জানায়। সুজয়বাবু বলেন, "ওটা একটা হাউসিং কমপ্লেক্সের বিজ্ঞাপন। আমরাই প্রথমে অ্যাডটা তৈরি করেছিলাম। ক্যাপশন ছিল, 'প্রতিটি ইঞ্চি মনের মতো'। ক্যাপশনসুদ্ধু চুরি হয়ে গেল।"

"কোন এজেন্সি করল?" জানতে চায় ঝিনুক।

"আর্টলাইন। ওদের বিজ্ঞাপনে মডেল পাজামা-পাঞ্জাবি পরে আছে, আমাদের ড্রেসিং গাউন।"

ম্যাগাজিনের পাতায় দেখা অ্যাডটা চোখে ভেসে উঠল ঝিনুকের। বলে ওঠে, "আর-একটা তফাত আছে। ওদের ছবিতে কোনও কটেজ নেই, সব ফ্ল্যাটবাড়ি।"

"সেটাই হওয়ার কথা। ওরা 'পূজালি' কমপ্লেক্সের বিজ্ঞাপন করেছে। যাদের কটেজের প্রভিশন নেই। আমরা করছিলাম ড্রিমল্যান্ডের বিজ্ঞাপন। প্রোমোটারের ভীষণ পছন্দ হয়েছিল অ্যাডটা। পূজালির বিজ্ঞাপন বেরোতেই, প্রচণ্ড খেপে গেল ড্রিমল্যান্ডের মালিক। ওরা আমাদের অনেক দিনের কাস্টমার। রেগেমেগে মামলা করতে গিয়েছিল কোর্টে। অনেক বুঝিয়ে নিরস্ত করি।"

সুজয়বাবুর কথা শেষ হতে, দীপকাকু বলেন, "আচ্ছা, আমাকে একটা কথা বলুন তো! আইডিয়া ছাড়াও আপনাদের বিজ্ঞাপনের কোন-কোন অংশ কপি হয়ে যাচ্ছে? আই মিন, ফোটোগ্রাফি অ্যাঙ্গেল, ক্যাপশনের লেটারের মাপ, কালার..."

কথার মাঝে পার্থবাবু বলেন, "সেটা বলা খুব শক্ত। ওরা হয়তো পুরো কনসেপ্টটাই পাচ্ছে। প্রয়োজনমতো কিছু কারিকুরি করছে নিজেরা। লোটাস এজেন্সি তো একবার হুবহু কপি করে দিল। মডেল পর্যন্ত এক।"

দীপকাকু ফের গুম মেরে গেলেন। এই কেসটায় ঝিনুক কোনও খই পাচ্ছে না। বিশেষ করে দীপকাকুর শেষ প্রশ্নটা শুনে সব কিছু গুলিয়ে গেল। এ সময় ঝিনুকের একটাই কাজ, এতক্ষণ যা যা শুনল ছোট করে নোট করা। নোটবুক, পেন সঙ্গেই আছে, যেমন থাকে তদন্তে অ্যাসিস্ট করার সময়। ভরসা হচ্ছে না বের করতে। কেন জানি মনে হচ্ছে, দীপকাকুও কেসটার কোনও কূল খুঁজে পাচ্ছেন না।

হঠাৎ কথা বলে উঠলেন দীপকাকু, "কনসেপ্ট পাচারের ব্যাপারে আপনারা তো নিজেদেরই সন্দেহ করেন, সুজয়বাবু এমন কথাই আমাকে বলেছিলেন।"

"হ্যাঁ, ঠিকই বলেছে।" বললেন গৌতম।

"এবার আমাকে এমন কোনও ঘটনার উদাহরণ দিন, যার থেকে আপনারা শিওর হয়েছেন, তিনজনের মধ্যেই একজন অপরাধী।"

"আমি বলছি।" বলে শুরু করলেন পার্থ, "একবার হয়েছিল কী, একটা মোবাইল ফোনের বিজ্ঞাপন আমরা নিউজপেপারে পাঠিয়ে দিয়েছি, মাথায় এল নতুন আইডিয়া, ক্যাপশন লেখা হবে এস এম এস-এর স্টাইলে, মানে বাংলা কথাটা ইংরেজি লেটারে লেখা। কাস্টমারের মতামত নেওয়ার কোনও প্রয়োজন নেই। তারা সবটাই আমাদের উপর ছেড়ে দিয়েছে। অ্যাডটা বদলানোর জন্য ফোন করলাম নিউজপেপারের অফিসে। তারা বলল, ম্যাটার প্রেসে চলে গিয়েছে। তখন আপশোস করা ছাড়া আর কিছুই করার নেই। বিজ্ঞাপনটা বেরনোর কথা রবিবারের সাপ্লিমেন্টারিতে। তখনও চারদিন বাকি। শনিবার অন্য কাগজে আর-একটা মোবাইল ফোনের বিজ্ঞাপন বেরিয়ে গেল। অবিকল আমাদের কনসেপ্ট। এমনকী, যে ক্যাপশনের আইডিয়া আমরা ছাপাতে পারিনি, সেটাও ছেপে বেরিয়ে গেল।" থামলেন পার্থবাবু। দম নিয়ে বললেন, "শেষ আইডিয়াটা শুধু আমাদের মধ্যেই ছিল, বাইরের কাউকে বলা হয়নি।"

প্রায় একই সঙ্গে গৌতমবাবু বলে ওঠেন, "এবার আপনাকে বের করতে হবে, এই তিনজনের মধ্যে কে বিশ্বাসভঙ্গ করছে?"

এ তো দেখা যাচ্ছে চোর নিজেই পুলিশকে নিয়োগ করছে তাকে ধরার জন্য! এটা কি এক ধরনের চ্যালেঞ্জ? দীপকাকুর উপর এঁদের কীসের এত রাগ! আগে তো কখনও দেখাই হয়নি। ঝিনুকের মাথা ভোঁ ভোঁ করছে। এই তিন পার্টনার যেন জলজ্যান্ত ধাঁধা। এঁরা দীপকাকুর প্রতি যে আচরণটা করছেন, অনায়াসে রিগিংয়ের সঙ্গে তুলনা করা যায়। এই চেম্বারটাকে গুহা বলে বোধ হচ্ছে ঝিনুকের। দীপকাকুকে নিয়ে মানে-মানে কেটে পড়তে পারলেই হয়। অবশ্যই অ্যাডভান্সের টাকাটা ফেরত দিয়ে।

সেরকম কোনও সদিচ্ছা দীপকাকুর নেই। জিজ্ঞেস করলেন, "আপনারা কেন ধরে নিচ্ছেন, তিনজনের একজন বেইমানিটা করছেন। দু'জন একসঙ্গে হয়েও তো করতে পারেন। উদ্দেশ্য, বাকি একজনকে অপদস্থ করা বা বিজনেস থেকে ছেঁটে ফেলা।"

কোনও উত্তর আসে না তিন পার্টনারের কাছ থেকে। একে অপরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করছেন। মনে-মনে দীপকাকুকে বাহবা দেয় ঝিনুক, জিতে গেলেন এই রাউন্ডে। ধাঁধাটাকে দিলেন আরও জটিল করে।

boierpathshala.blogspot.com

খানিকক্ষণ সবাই চুপচাপ। প্রসঙ্গ থেকে সরে এসে দীপকাকুই শুরু করেন, "আপনারা কি বিজনেস নিয়ে বাড়িতে বা অন্য কোনও ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-বন্ধুর সঙ্গে আলোচনা করেন?"

"আমি তো করি না।" বললেন সুজয়বাবু।

"আমিও না।" একই কথা প্রায় একই সঙ্গে বললেন পার্থ ও গৌতম।

"আর-একটা কথা, আপনাদের ব্যবসা সংক্রান্ত গোপনীয় মিটিংগুলো নিশ্চয়ই এই চেম্বারেই হয়?" জানতে চান দীপকাকু।

মাথা নেড়ে সায় দেন তিন পার্টনার। দীপকাকু পরের প্রশ্নে যান, "ফোনের মাধ্যমে আলোচনা করে কোনও গুরুত্বপূর্ণ ডিসিশন নেন কি?"

"জেনারেলি না।" বললেন গৌতমবাবু। তিন জনের চোখেই অবোধ দৃষ্টি, ধরতে পারছেন না কেন এই প্রশ্নগুলো করছেন দীপকাকু। শেষ প্রশ্নটা অন্তত বুঝতে পেরেছে ঝিনুক, ফোন-ট্যাপের আশঙ্কা করছেন দীপকাকু।

চাকা লাগানো চেয়ারটা একটু পিছিয়ে নিয়ে দীপকাকু বসে থেকেই ঘরের চারপাশে চোখ বোলালেন। এক সময় দৃষ্টি স্থির হল তিন পার্টনারের উপর। বললেন, "আমি আপনাদের সার্চ করব।"

তিন বন্ধু তো বটেই, দীপকাকুর প্রস্তাবে ঝিনুকও একটু হতচকিত হল। পার্থবাবু কপাল কুঁচকে জানতে চাইলেন, "হঠাৎ সার্চ কেন?"

"দেখব, আপনাদের কারও কাছে স্পাই ক্যামেরা বা টেপরেকর্ডার আছে কিনা।"

গৌতমবাবুর ঠোঁটে বাঁকা হাসি। বললেন, "এটা কী ধরনের ইনভেস্টিগেশন মশাই! আমরা যখন সশরীরে এখানে আছি, লুকিয়ে ক্যামেরা, টেপ আনতে যাব কেন? যা দেখার বা শোনার নিজের চোখে, কানেই তো হয়ে যাচ্ছে।"

দীপকাকু বলেন, "আপনাদের কথামতো আমি কিন্তু এখনও ধরে নিইনি, তিনজনের মধ্যে থেকে খবর বেরিয়ে যাচ্ছে। এ-ব্যাপারে চতুর্থ কোনও ব্যক্তির হাত আছে কিনা আমায় দেখতে হবে। এমন হতেই পারে, অগোচরে বাড়ির কেউ আপনাদের পোশাকে স্পাই ক্যামেরা বা টেপরেকর্ডার ঢুকিয়ে দিচ্ছে। জানেনই তো সেগুলোর সাইজ খুব ছোট। অনায়াসে পোশাকের আনাচকানাচে রেখে দেওয়া যায়।"

কথাটা সম্ভবত তিন বন্ধুর মনে ধরল। চোখেমুখে আত্মসমর্পণের ভাব। অর্থাৎ দীপকাকু যা ভাল বুঝবেন, করবেন। ওঁদের কোনও আপত্তি নেই।

চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লেন দীপকাকু। ও প্রান্ত থেকে সুজয়বাবুও উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, "নিন, আমাকে দিয়ে শুরু করুন।"

ঝিনুক অবাক হয়ে দেখতে লাগল, কী নিপুণ ভঙ্গিতে দীপকাকু সার্চ করতে লাগলেন। যেন বেশ কিছু বছর বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্সে চাকরির অভিজ্ঞতা আছে। অতি দ্রুত শার্ট-প্যান্টের সমস্ত অংশে চলে যাচ্ছে হাত, জুতো খোলালেন। আলাদা করে পরীক্ষা করলেন জুতোগুলো। একই প্রক্রিয়া চলল তিন জনের উপর। কারও কাছে কিছু পাওয়া গেল না।

ঝিনুক ছাড়া সবাই এখন দাঁড়িয়ে আছেন। দীপকাকু বলেন, "এবার আমি ঘরটা সার্চ করব। আপনারা বাইরে অপেক্ষা করুন।" ঝিনুকের দিকে তাকিয়ে বললেন, "তুমি রিসেপশনে গিয়ে বোসো। কাজ শেষ হলে যাচ্ছি।"

আদেশটায় বিমর্ষ হতে গিয়েও হয় না ঝিনুক। দীপকাকুর ঘর সার্চ করার ধরনটা ভীষণ বোরিং। শুঁচ্ছেন, বসছেন, হামাগুড়ি দিচ্ছেন, কান পাতছেন, গন্ধ শুঁকছেন, সে এক জগঝম্প ব্যাপার। তাকিয়ে থাকতে-থাকতেই ক্লান্ত হয়ে পড়ে ঝিনুক। তার চেয়ে বাইরে বসে থাকাই ভাল। পরে রেজাল্টটা জেনে নেবে।

একে-একে তিন পার্টনার চেম্বার থেকে বেরিয়ে গেলেন। ঝিনুকও বেরোতে যাবে, দ্যাখে, দীপকাকু হামাগুড়ি দিয়ে সেক্রেটারিয়েট টেবিলের তলায় ঢুকে যাচ্ছেন।

রিসেপশনের সামনের সোফায় বসেছে ঝিনুক। রিসেপশনিস্ট আগের মতোই ব্যস্ত। তবে এবার ওঁর আচরণ একটু অন্যরকম। কাজের ফাঁকে যখনই ঝিনুকের সঙ্গে চোখাচোখি হচ্ছে, মিষ্টি করে হাসছেন। হাসি বিনিময় করছে ঝিনুক। ভদ্রমহিলা তাকে দেখে কেন হাসছেন, তা এখনও অবধি ঝিনুক বুঝে উঠতে পারেনি।

একটা সময় রিসেপশনিস্ট মহিলা একটু ফাঁকা হলেন। কাউন্টারে কোনও ভিজিটর নেই, ফোনও বাজছে না। ঝিনুকের দিকে তাকিয়ে ভদ্রমহিলা জানতে চান, "রেজাল্ট কী হল?"

ঘাবড়ে যায় ঝিনুক, কীসের রেজাল্ট জানতে চাইছেন? ঝিনুক সত্যিই একটা ফলাফলের অপেক্ষায় বসে আছে, এম ডি-র চেম্বারে কিছু পাওয়া গেল কিনা? তা হলে কি রিসেপশনিস্ট এবং কর্মীরাও জানেন, কেন ঝিনুকরা এখানে এসেছে?

ঝিনুককে এতটা অপ্রস্তুত হতে দেখে মহিলার ভ্রু-জোড়া ঘনিষ্ঠ হয়। একটু অবাক কণ্ঠে বলেন, "তুমি মডেলিংয়ের জন্য আসোনি?"

"না তো।" বিস্মিত হয়ে বলে ঝিনুক।

"ওঃ, আই অ্যাম রিয়েলি সরি। আসলে পোর্টফোলিও পাঠিয়ে কোনও ক্যান্ডিডেট যদি সিলেক্টেড হয়, অভিভাবকের সঙ্গে আসে দেখা করতে।"

"না না, আমাদের সেরকম কোনও ব্যাপার নেই।" শুধরে দিয়ে মিষ্টি করে হাসে ঝিনুক।

ফোন বেজে ওঠে রিসেপশন ডেস্কে। রিসিভার তুলে কথা বলেন রিসেপশনিস্ট। ফোন নামিয়ে ফের ঝিনুকের উদ্দেশে বলেন, "যদি কিছু না মনে করো, একটা কথা বলি?"

ঝিনুক ঘাড় হেলিয়ে সম্মতি জানায়। মহিলা বলেন, "তুমি কিন্তু ইজিলি মডেলিংয়ে আসতে পার। দারুণ গ্রেসফুল দেখতে তোমাকে।"

আচমকা কমপ্লিমেন্ট পেলে সকলেরই স্মার্টনেস উধাও হয়ে যায়। ঝিনুকের মুখেও লজ্জা পাওয়া হাসি। এর ফাঁকে মহিলা জানতে চান, "তোমার নাম কী?"

"আঁখি। আঁখি সেন।"

"ফোন নম্বর?"

ইতস্তত করে ঝিনুক। রিসেপশনিস্ট পেন হাতে তুলে অপেক্ষায় আছেন। নম্বরটা বলেই দেয় ঝিনুক। তার সঙ্গে এ কথাও বলে, "আমার কিন্তু মডেলিংয়ে কোনও ইন্টারেস্ট নেই।"

"সে পরে দেখা যাবে। কনট্যাক্ট নম্বরটা তো নেওয়া থাক। আমি তো জানি, এক-এক সময় নতুন মুখ খুঁজতে গিয়ে কী ছোটাছুটি করতে হয়। তোমার নম্বরটা দিতে পারলে আমার ইমপর্ট্যান্স বাড়বে কোম্পানিতে।"

রিসেপশনিস্টের কথা শেষ হতে না-হতেই ঝিনুক দ্যাখে, কোমর সমান পুশডোর ঠেলে বেরিয়ে আসছেন দীপকাকু। কিন্তু এ কী চেহারা হয়েছে। চুল এলোমেলো, নাকের ডগায় চশমা। ইন করা শার্ট এখন বাইরে। প্যান্টও কুঁচকনো, যেন ভিতরে বিছিরি মারপিট হয়েছে। ঝিনুক জানে আসলে তা নয়, ঘরটর সার্চ করার পর দীপকাকুর চেহারা এরকমই হয়। মুখটা ভীষণ থমথমে। তার মানে কিছুই পাওয়া যায়নি। ঝিনুকের পাশে এসে বলেন, "চলো।"

সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়ায় ঝিনুক। দীপকাকুর হাতে ব্রাউন রঙের বড়সড় প্যাকেট। ভিতরে কী আছে, এখনই জানতে চাওয়া ঠিক হবে না। দীপকাকুর মুড একদমই ভাল নেই।

চারতলা থেকে লিফ্‌টে করে নেমে এল ঝিনুকরা। লাউঞ্জের বাইরে ঝাঁ ঝাঁ রোদ। অফিসের ভিতরে থেকে টের পাওয়া যায়নি বেলা এত বেড়েছে।

মেন গেটের একটু ভিতরে দীপকাকুর বাইক। বড্ড তাড়াতাড়ি হেঁটে যাচ্ছেন সেটা লক্ষ করে। তাল রাখতে প্রায় দৌড়তে হচ্ছে ঝিনুককে।

বাইকের সামনে গিয়ে দীপকাকু কেমন জানি থমকে গেলেন। ঝিনুক ততক্ষণে পৌঁছে গিয়েছে পাশে। স্পিডোমিটারের কাচের উপর একটা চিরকুট। তুলে দিলেন দীপকাকু। নিজে পড়ে ঝিনুকের হাতে দিলেন। চিরকুটে লেখা, 'কেসটা ছেড়ে দিন। আগুনে হাত দেবেন না।'

boierpathshala.blogspot.com

গোটা-গোটা অক্ষর, কম্পিউটার প্রিন্ট। বারচারেক পড়ে মুখ তোলে ঝিনুক, দীপকাকু পাশে নেই! কোথায় গেলেন?

এপাশ-ওপাশ তাকাতে, চোখে পড়ে গেটে দাঁড়ানো সিকিউরিটি গার্ডের সঙ্গে কথা বলছেন দীপকাকু। গার্ডের হাবেভাবে বিস্ময়। বাইকের দিকে বারবার দেখছে আর মাথা নাড়ছে। এখানে দাঁড়িয়েই ঝিনুক বুঝতে পারে, লোকটা খেয়ালই করেনি বাইকের সামনে কেউ এসেছিল কিনা।

দীপকাকু ফিরে আসছেন। মুখ-চোখ ভীষণ সিরিয়াস। একটু যেন রাগও ঘনিয়েছে মুখে। ঝিনুকের সামনে এসে ব্রাউন প্যাকেটটা ধরতে দেন। বাইকের হ্যান্ডেল ধরে স্টার্ট কিক মারতে-মারতে বলেন, "আবার খবর বেরিয়ে গেল।"

॥ ৩ ॥

পরের দিন। দুপুর দু'টো। পার্ক স্ট্রিটের একটা রেস্তরাঁয় বসে আছেন দীপকাকু আর ঝিনুক। এখন অবধি ঝিনুক জানে না, তারা কেন এসেছে এখানে। রেস্তরাঁয় ঢোকার আগে ঝিনুক সরল মনে বলেই ফেলেছিল, "এই তো বাড়ি থেকে লাঞ্চ করে বেরোলাম, এখন আবার...."

"আমরা এখানে খেতে আসিনি। অন্য কাজে এসেছি।" গম্ভীর স্বরে বলেছিলেন দীপকাকু।

খুবই লজ্জায় পড়ে যায় ঝিনুক। অবশ্য টেবিলে এসে একদম শুকনো বসিয়ে রাখেননি দীপকাকু। দু'টো মকটেল নিয়েছেন। স্ট্র-এ সিপ দিতে-দিতে ঝিনুক চোখ বোলাচ্ছে ডাইনিং হলে। দামি হোটেলের গ্রাউন্ড ফ্লোর রেস্তরাঁ। নরম আলো। চড়া এসি। ছড়িয়ে-ছিটিয়ে বসে জনাপনেরো অ্যারিস্টোক্র্যাট চেহারার মহিলা, পুরুষ চুপচাপ খেয়ে যাচ্ছেন। কখনও সামান্য ফিসফিস। দু'জনকে দেখা যাচ্ছে, একা-একা বসে লাঞ্চ সারছেন। একজন আবার ম্যাগাজিন পড়তে-পড়তে। ধরনটা যেন বাড়ির ডাইনিংয়ে বসে আছেন। রেগুলার আসেন মনে হয়। কিন্তু দীপকাকু কেন এখানে এলেন? সেটা এখনও বুঝে উঠতে পারছে না ঝিনুক। কারণ তো একটা নিশ্চয়ই আছে। দীপকাকুকে এক্ষুনি জিজ্ঞেস করা ঠিক হবে না। অপারেশন চলাকালীন কৌতূহল দেখালে বিরক্ত হন দীপকাকু। কিছু যে একটা ঘটছে অথবা যে-কোনও মুহূর্তে ঘটতে পারে, দিব্যি টের পাচ্ছে ঝিনুক। দীপকাকুর চোখ-মুখের সতর্ক ভাব তারই আগাম ইঙ্গিত।

কাল অ্যারো কোম্পানি থেকে বেরিয়ে ঝিনুককে বাড়ি পৌঁছে দিতে এসে, কিছুক্ষণ বসে গেলেন দীপকাকু। বাবা তখনও অফিসে বেরোননি। অফিস যাওয়ার কোনও ফিক্সড টাইম নেই বাবার। কেসটা বেশ জটিল বলেই বাবার সঙ্গে কিছুটা আলোচনা করার ইচ্ছে ছিল দীপকাকুর। লাভ হয়নি। সব শুনে বাবা বলেছিলেন, "কেস ইজ ভেরি মাচ সিম্পল।"

"কীরকম?" জানতে চেয়েছিলেন দীপকাকু।

বাবা বলেন, "ওই পার্টনারের মধ্যে যে-কোনও একজন ঘুমের মধ্যে কথা বলেন। তখনই স্ত্রী অথবা ছেলেমেয়ে নেক্সট অ্যাডের প্ল্যানটা শুনে নিয়ে বাইরে বিক্রি করে দিচ্ছেন।"

"অ্যাবসার্ড।" মন্তব্য করেছিলেন দীপকাকু। কিন্তু ঝিনুকের মনে হয়েছিল, বাবার যুক্তি শুনতে জোক্‌স টাইপের লাগলেও, পুরোটা ফেলে দেওয়ার নয়। সেটুকু নস্যাত করতে দীপকাকু বলেন, "একটা লোক ঘুমের ঘোরে হুবহু অ্যাড প্ল্যান বলে যাবে, এ হতেই পারে না। ঘুমন্ত মানুষের কথা অত্যন্ত অস্পষ্ট।"

নিজের যুক্তির সপক্ষে বাবা একটা মরিয়া চেষ্টা চালান। বলেন, "তুমি হয়তো জানো না দীপঙ্কর, রিসেন্টলি জাপানে এমন একটা লোকের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে, যে কিনা সারাদিনে যা কথা বলে, রাতে ঘুমনোর পর একই কথা রিপিট করে। ইন্টারনেটে ঘাঁটলেই ইনফরমেশনটা পেয়ে যাবে তুমি।"

হতাশ হয়েছিল ঝিনুক। কিছুদিন ধরে কেন কী জানি, বাবা জাপান দেশটাকে খুব ফেভার করছেন। নিজের বানানো আশ্চর্য ঘটনার গৌরব চাপিয়ে দিচ্ছেন জাপানের উপর। দীপকাকুও ব্যাপারটা জানেন। তাই প্রসঙ্গটা নিয়ে গিয়েছিলেন অন্য খাতে। বলেছিলেন, "আমি ভেবেছিলাম, এই কেসটা শুধুই বুদ্ধির খেলা, ভদ্রস্থ ধরনের। কিন্তু বাইকে রেখে যাওয়া হুমকির চিঠিটা আমাকে ভাবাচ্ছে। কেসটার ভিতরে আরও অজানা রহস্য আছে। যেটা ইচ্ছে করেই আমাদের কাছে চেপে গিয়েছেন তিন পার্টনার।"

ওই সময় ঝিনুক একটা প্রশ্ন করে, "তিন বন্ধুর মধ্যে একজন অথবা দু'জন মিলে যদি অপরাধী হন, বাইকে চিঠি রাখতে বলার সময় পেলেন কখন? ওঁরা তো আপনার সঙ্গেই ছিলেন?"

"সময় পেয়েছেন। তিনজনকে ছেড়ে বাইকের কাছে পৌঁছতে আমার মিনিট তিন-চারেক লেগেছিল। ওইটুকু সময়ের মধ্যে সেলফোনে বাইরের কাউকে অর্ডার করে দেওয়া অসম্ভব নয়।"

প্রশ্নটা কোনও দিশা দিতে পারল না। দমে গিয়েছিল ঝিনুক। পরক্ষণেই চোখ পড়ে দীপকাকুর হাতের ব্রাউন প্যাকেটে। ওটার বিষয় তো কিছু জানা হয়নি। জিজ্ঞেস করেছিল, "প্যাকেটে কী নিলেন আপনি?"

দীপকাকু বলেছিলেন, "যেসব অ্যাড চুরি গিয়েছে, আসল এবং নকলের ফোটোকপি করা সিডি, কিছু পেপার কাটিং। যারা নকল করেছে তাদের নাম-ঠিকানা, বিজনেস কেমন চলে, সেই সব তথ্য। এগুলো নিয়ে আজ রাতে বসব। ভাল করে স্টাডি করতে হবে।"

স্টাডি করে দীপকাকু কী পেলেন ঝিনুক জানে না। আজ দুপুর বারোটা নাগাদ ফোন এল দীপকাকুর, "তৈরি হয়ে নাও। আধঘণ্টার মধ্যে আসছি।"

ভাগ্যিস মা জোর করে ভাত খাওয়ালেন, না হলে শরবত খেয়েই লাঞ্চ সারতে হত ঝিনুককে। দীপকাকুকে অ্যাসিস্ট করার ব্যাপারে মা এখন আর খুব একটা আপত্তি করেন না। বুঝে গিয়েছেন, তাঁর মেয়ে আর-পাঁচটা মেয়ের চেয়ে আলাদা।

দীপকাকুর সেলফোন বাজছে। চাপা কিচকিচ শব্দ। আওয়াজটার মধ্যে সাসপেন্সের ভাব আছে। গোয়েন্দার সেলফোনে এরকম রিংটোনই মানায়।

ফোন কানে নিচু গলায় কথা বলছেন দীপকাকু। এই মুহূর্তে কোথায় আছেন বললেন। ওপারের কথা শুনে নিয়ে বললেন, "এগোচ্ছে।" তারপর দু'-একটা হুঁ-হাঁ। সব শেষে ঝিনুকদের বাড়ির ফোন নম্বর। বাবার সেলফোন নম্বর।

অবাক হয় ঝিনুক, ফোনটা সম্ভবত দীপকাকুর কোনও ক্লায়েন্টের। ঝিনুকদের নম্বর চাইছে কেন?

ঝিনুকের মুখ থেকে প্রশ্নটা পড়ে নিলেন দীপকাকু। ফোনটা বুক পকেটে রেখে বললেন, "সুজয়বাবুর ফোন। তদন্ত কেমন এগোচ্ছে খোঁজ নিলেন। নানান কথায় ভুলে গিয়ে রজতদার কন্ট্যাক্ট নম্বরটা নেওয়া হয়নি ওঁর, জেনে নিলেন।

কথা শেষ করে একটু ঝুঁকে দীপকাকু জিজ্ঞেস করলেন, "দ্যাখো তো, আমার পিছনের ম্যাগাজিন পড়া লোকটার খাওয়া শেষ হল কিনা?"

ওই লোকটাই তার মানে দীপকাকুর টার্গেট। দীপকাকুর কাঁধের উপর দিয়ে মানুষটাকে দ্যাখে ঝিনুক, ন্যাপকিনে মুখ মুছছে। অস্ফুটে ঝিনুক বলে, "হয়ে গিয়েছে খাওয়া।"

দীপকাকু উঠে পড়েন চেয়ার ছেড়ে। ঝিনুককে বলেন, "তুমি এখানেই বসে থাকো। ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলে আসছি।"

লোকটার পরিচয়, দীপকাকুর কী প্রয়োজন তাঁর সঙ্গে, কিছুই জানে না ঝিনুক, আন্দাজও করতে পারছে না। ভীষণ কৌতূহলে তাকিয়ে থাকে দীপকাকুর হেঁটে যাওয়ার দিকে।

টেবিলের সামনে গিয়ে ভদ্রলোককে সম্ভবত নিজের কার্ড দিলেন দীপকাকু। উনি বেশ অবাক হয়েছেন, কার্ডটা পড়ে আরও বিস্মিত হলেন। দীপকাকুকে কী যেন বললেন। উত্তর দিলেন দীপকাকু। ঝিনুকের অস্বস্তি বাড়ে, এত দূরে বসে কথাবার্তা কিছুই শুনতে পাচ্ছে

boierpathshala.blogspot.com

না। তবে দু'জনের বডি ল্যাঙ্গোয়েজ দেখে আন্দাজ করা যাচ্ছে, আলাপপর্ব মোটেই সৌজন্যমূলক হচ্ছে না। ঝগড়ার ধরন চলে আসছে।

ঝিনুকের আন্দাজ মিলে গেল। ভদ্রলোক তেড়েফুঁড়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। বেশ চিৎকার করেই বললেন, "আই অ্যাম নট বাউন্ড টু আনসার ইওর কোয়েশ্চেন।"

উত্তরে দীপকাকু কী বললেন শোনা গেল না। লোকটা আরও খেপে গেল, "ডু হোয়াট ইউ ক্যান। প্রয়োজন মনে করলে কোর্টে যান। আমার পিছনে ঘুরে কী হবে?"

"আপনার নয়, আমি ঘুরছি কেসটার পিছনে। যেটা একদমই আপনার পছন্দ নয়, সেই কারণেই এই চিরকুটটা আপনি আমার বাইকে রেখে দেওয়ার বন্দোবস্ত করেন।"

দীপকাকুর কথা এখন স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে। পকেট থেকে বের করে দেখাচ্ছেন গ্রেটনিং দেওয়া সেই চিরকুট। ভদ্রলোক এমন ভাব করছেন, যেন চিনতেই পারছেন না লেখাটা। হাত বাড়িয়ে নিতে গেলেন। দীপকাকু সরিয়ে নিয়ে বললেন, "এটা নিয়ে আমি পুলিশের কাছে যাব।"

আগের মেজাজে ফিরে ভদ্রলোক বললেন, "যান, যেখানে খুশি যান। ইউ মে লিভ নাউ।"

ধপাস করে চেয়ারে বসে পড়লেন ভদ্রলোক। যথেষ্ট বিধ্বস্ত লাগছে তাঁকে। এত তাড়াতাড়ি ধরা পড়ে যাবেন ভাবতে পারেননি। ওঁর মতো অতোটা না হলেও ঝিনুকের খারাপ লাগে, কেসটা এত দ্রুত শেষ হয়ে যাক সে চায়নি।

দীপকাকু ফিরে এসেছেন চেয়ারে। কী যেন চিন্তা করছেন। কেস যখন সল্‌ভ হয়েই গিয়েছে, ভাবার কী আছে এত! ঝিনুক জানতে চায়, "কে লোকটা?"

"রূপরেখার মালিক। পোস্টারিংয়ের কুকীর্তির জন্য যে দায়ী।"

"উনিই কি মেন কালপ্রিট? খবর বের করে নিচ্ছেন অ্যারো কোম্পানি থেকে?"

উত্তরে মাথা নাড়েন দীপকাকু। বলেন, "জানি না।"

ঝিনুক উৎসাহিত হয়, যাক, কেস তার মানে এখনও শেষ হয়নি। ফের প্রশ্ন করে, "কী বললেন ওঁকে, অত খেপে গেলেন কেন?"

"জানতে চাইলাম, কেন এই অপকর্মটা করেছেন? বলল, দেওয়াল কোনও এজেন্সির ভাড়া করা নয়। আমি ওদের পোস্টারের উপর পোস্টার সাঁটিনি, দু'ইঞ্চি ছেড়ে সেঁটেছি। আপনার যদি কিছু করার থাকে কোর্টে যান।" থামলেন দীপকাকু। একটু ভেবে নিয়ে বললেন, "আসলে লোকটা জানে আইন-আদালত করে ওকে ফাঁসানো যাবে না। পারমিশন ছাড়া অন্যের দেওয়ালে পোস্টার সাঁটা বেআইনি। সেদিক থেকে দু'টো এজেন্সি সমান দোষী।"

ঝিনুক বলে, "হুমকির চিঠিটা যে উনিই দিয়েছেন, কী করে শিওর হলেন আপনি?"

"শিওর নই। তবু চার্জ করে দেখলাম কোনও ক্লু বেরোয় কিনা। বেরোল না। এই কেসের সবচেয়ে মুশকিলের দিক হচ্ছে, কোনও ফাঁক পাচ্ছি না, যেখান থেকে তদন্ত শুরু করব। গোটা বিষয় তিন পার্টনারের মধ্যে আটকে আছে। সেই কারণেই আমি উলটো দিক থেকে তদন্তে ঢুকতে চাইছিলাম।"

"মানে?" জানতে চায় ঝিনুক।

"যারা অ্যারো এজেন্সির কনসেপ্ট হাতিয়ে কাজে লাগাচ্ছে, তাদের ইনভেস্টিগেট করা। কিন্তু যা দেখছি, অন্য এজেন্সিগুলো আমার সঙ্গে রূপরেখার মতোই ব্যবহার করবে।"

দীপকাকুকে বেশ হতাশ লাগছে। এই হতাশার খানিকটা হয়তো সদ্য অপমানিত হওয়ার কারণে। ঝিনুক রাগ-রাগ চোখে রূপরেখার মালিকের টেবিলের দিকে তাকায়, বিল মেটাচ্ছেন।

ঝিনুক দীপকাকুকে জিজ্ঞেস করে, "ভদ্রলোক যে এখানে লাঞ্চ করতে আসছেন, জানলেন কী করে?"

প্রশ্নটা করার পরই ঝিনুকের মনে হল, বেকার জিজ্ঞেস করল। দীপকাকু কত দ্রুত, নানান সোর্স থেকে খবর জোগাড় করেন, ঝিনুক দেখেছে। তা ছাড়া সুজয়বাবু তাঁদের শত্রুপক্ষের সমস্ত ইনফরমেশন ব্রাউন প্যাকেটে করে দীপকাকুকে দিয়েছেন।

খানিক পরে উত্তর অবশ্য একটা এল। অন্যমনস্ক গলায় দীপকাকু বললেন, "রূপরেখার অফিসটা এই হোটেল থেকে পায়ে হেঁটে দু'মিনিটের পথ। মিস্টার তালুকদার রোজ এখানেই লাঞ্চ সারেন।"

ভদ্রলোকের নামটা মনে-মনে নোট করে নেয় ঝিনুক। পরে ওর ডায়েরিতে লিখে নেবে। মিস্টার তালুকদার হেঁটে যাচ্ছেন দরজার দিকে। আচমকাই ঝিনুকদের দিকে তাকালেন। বেশ ভয় পাইয়ে দেওয়া চাউনি।

দীপকাকু লক্ষ করেননি, সেলফোন হাতে নিয়ে কাকে যেন ফোন করছেন। তালুকদার লোকটা কতটা মারাত্মক ঠিক আন্দাজ করা যাচ্ছে না। ঝিনুক আপাতত মন দেয় দীপকাকুর কথায়। ফোনে মনে হচ্ছে ফের সুজয়বাবুকেই ধরেছেন। তালুকদারের সঙ্গে বচসার বিবরণ দেওয়ার পর বললেন, "আপনাদের চার কম্পিটিটরের মধ্যে নরম মানুষ কে, যার সঙ্গে দু'টো কথা বলা যায়?"

ও প্রান্ত কী বলছেন শোনার উপায় নেই। এ প্রান্তে দীপকাকু বললেন, "নার্সিং হোম! পাব এখন?"

সুজয়বাবু ও প্রান্তে কিছু বললেন, শুনে নিয়ে ফোন পকেটে পুরলেন দীপকাকু। বললেন, "চলো, যাওয়া যাক।"

"কোথায়?"

দীপকাকু বলতে যাচ্ছেন, রেস্তরাঁর বয় এসে দাঁড়ায়, হাতে ভাঁজ করা ছোট কাগজ। ট্রেতে আনেনি যখন, বিল নয় বোঝাই যাচ্ছে। চিরকুটটা দীপকাকুর দিকে এগিয়ে দিয়ে বলে, "ওই টেবিলের বাবু আপনাকে দিতে বললেন।"

"কোন বাবু?" জানতে চেয়ে কাগজটা হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছেন দীপকাকু। বয় যেদিকে আঙুল তুলেছে, সেখানে কেউ বসে নেই। টেবিলে শুধু একটা গ্লাস। বয় ভীষণ অবাক হয়েছে। বলে, "এক্ষুনি তো আমায় দিলেন কাগজটা। কোথায় গেলেন?"

চিরকুটে একবার চোখ বুলিয়ে ঝিনুকের হাতে দেন দীপকাকু। বয়কে বলেন, "এসো তো আমার সঙ্গে।"

দীপকাকুকে অনুসরণ করতে-করতে কাগজটা পড়ে নেয় ঝিনুক। আগের হুমকির চিঠির মতোই কম্পিউটারে বাংলায় লেখা— 'এখনও বলছি কেসটা ছেড়ে দিন। ওরা যা দেবে তার ডবল দেব আমরা।'

এই ক'টা অক্ষরের মধ্যে অনেক প্রশ্ন উঠে আসছে। আগের চিঠিটা তুলনামূলক সোজাসাপটা ছিল। আপাতত লেখাটার দিকে মন না দিলেও চলবে, যে পাঠাল, তার খোঁজ আগে চাই। ঝিনুকরা পৌঁছে গিয়েছে নির্দিষ্ট টেবিলের সামনে। আধখাওয়া লস্যির গ্লাসটা প্রমাণ দিচ্ছে, একটু আগে এখানে কেউ বসেছিল।

"টয়লেটে যাননি তো?" বলল বয়।

গ্লাসের দিকে তাকিয়ে থেকে দীপকাকু বললেন, "ঝট করে একবার দেখে এসো তো।"

বয় চলে যেতে ঝিনুক জিজ্ঞেস করে, "লোকটা কি তালুকদারের?"

"চান্স কম। তালুকদারের সঙ্গে আমার ঝগড়া হয়েছে দশ মিনিট হয়নি। এর মধ্যে কম্পিউটারে প্রিন্ট আউট বার করে হুমকি দেওয়া..." বলতে-বলতে চিন্তার গভীরে তলিয়ে গেলেন দীপকাকু। ঝিনুক বলে, "আপনি তো বলছিলেন, রূপরেখার অফিসটা এখান থেকে দু' মিনিটের পথ।"

কথাটা দীপকাকু শুনলেন কিনা বোঝা গেল না। দৃষ্টি গ্লাসের দিকে, মাথায় কী ঘুরছে কে জানে। বয় ফিরে এসেছে। বলে, "না, টয়লেটে নেই। লস্যির বিলটাও দিয়ে যায়নি।"

মুখ তোলেন দীপকাকু। বয়কে বলেন, "লোকটার চেহারাটা কেমন বলো তো?"

"বয়স স্যার, চল্লিশটল্লিশ হবে। জিনস আর শার্ট পরেছিল।"

"গোঁফ, চশমা?" জানতে চান দীপকাকু।

boierpathshala.blogspot.com

"চশমা ছিল না, গোঁফ ছিল স্যার।"

"হিন্দিতে কথা বলছিল, না বাংলায়?" এটা জানতে চায় ঝিনুক।

বয় উত্তর দেওয়ার আগে দীপকাকু বলেন, "কলকাতার বাঙালিরা অনেকেই ভাল হিন্দি বলে, কোন ভাষার লোক অত সহজে বোঝা যাবে না।"

টেবিল ঘিরে কিছু যে একটা ঘটছে, টের পেয়ে সুট-টাই পরা রেস্তরাঁর কর্তাব্যক্তি এগিয়ে এলেন, "মে আই হেল্প ইউ?"

ভদ্রলোককে আপাদমস্তক দেখে, দীপকাকু নিজের কার্ড বের করে তাঁর হাতে দিলেন। কার্ডটা পড়ার সঙ্গে-সঙ্গে ভদ্রলোকের চেহারায় সম্ভ্রম মেশানো কৌতূহল দেখা দিল। জানতে চাইলেন, "আর ইউ লুকিং ফর সামথিং?"

ঘাড় উপর-নিচ করে উত্তর দিলেন দীপকাকু। ভদ্রলোক আবার বলেন, "ক্যান আই বি অ্যাট ইওর সারভিস?"

"হ্যাঁ, আমাকে একটা ব্যাপারে পারমিশন দিতে হবে।"

"বলুন স্যার!"

"এই গ্লাসটা আমি নিয়ে যাব।"

"ওহ শিওর!" বলে ভদ্রলোক নিজেই লস্যির গ্লাসটা তুলতে যাচ্ছিলেন, দীপকাকু বাধা দেন। বলেন, "দাঁড়ান, হাত দেবেন না, একটা বক্স নিয়ে আসুন।"

তড়িঘড়ি পায়ে ম্যানেজার ছুটলেন বক্স আনতে।

রেস্তরাঁর বাইরে এসেছেন ঝিনুক, দীপকাকু। পার্ক স্ট্রিট এখন মোটামুটি ফাঁকা। রাস্তায় চড়া রোদ, ছায়ার জ্যামিতিক ডিজাইন।

ম্যানেজারের দেওয়া বক্সটা দীপকাকু নিয়েছেন ক্যারিব্যাগে। বক্সের মধ্যে আছে গ্লাসটা। হ্যান্ডপ্রিন্ট নেওয়ার জন্য কত সতর্কভাবে জিনিসটা প্যাক করতে হয়, এই প্রথম দেখল ঝিনুক। প্রথমে গ্লাসের উপরের অংশটুকু ধরে লস্যি আর স্ট্র বাস্কেটে ফেললেন দীপকাকু। ম্যানেজারের নিয়ে আসা বক্সটার নীচে টিসু পেপারের প্যাক দিলেন, গ্লাসটা আলতো করে রেখে, উপরে দিলেন আর-একটা প্যাক। বক্সের ঢাকা বন্ধ করলেন। গ্লাসের বডিতে অন্য কোনও ছাপ লাগার চান্স রইল না।

ক্যারিব্যাগটার দিকে তাকিয়ে হাঁটছিল ঝিনুক। দাঁড়িয়ে গেলেন দীপকাকু। বললেন, "তুমি ট্যাক্সি নিয়ে বাড়ি চলে যাও।"

"কেন?"

"আমাকে এখন ফরেনসিক ল্যাবে যেতে হবে। হাতের ছাপটা নিয়ে রাখা ভাল। লোকটার সঙ্গে আবার আমাদের দেখা হবে।"

এখনই বাড়ি ফিরতে ইচ্ছে করছে না ঝিনুকের। হঠাৎ মনে পড়ে যায় একটা কথা। বলে ওঠে, "আপনি যে কোথায় একটা যাওয়ার কথা বলছিলেন তখন, নার্সিং হোম..."

দীপকাকু যেন একটু অন্যমনস্ক। বললেন, "সেটা কাল গেলেও চলবে।"

"কোন নার্সিং হোম?" জানতে চায় ঝিনুক।

" 'রিপোজ অন' নিউ আলিপুরে। সুজয়বাবুর ডাক্তারবন্ধু অজিত রায়ের নার্সিং হোম।"

বাকিটা দীপকাকুকে না বললেও চলবে। ঝিনুক আগের তথ্য অনুযায়ী জানে, অজিতবাবুর একটা অ্যাড এজেন্সি আছে, নাম চিত্রা। উনি একবার অজান্তে অ্যারোর বিজ্ঞাপন কপি করেছিলেন।

পার্কিং লটের দিকে হাঁটতে-হাঁটতে দীপকাকু স্বগতোক্তির ঢঙে বলছেন, "সুজয়বাবু তো বললেন, তাঁর এই ডাক্তার বন্ধুটির ব্যবহার ভাল। কার থেকে, কীভাবে অ্যাড কপিটা জোগাড় করেছিলেন, জানা গেলেও যেতে পারে। সুজয়বাবুরা অবশ্য অভিমানে এ-বিষয়ে ডিটেলস কিছু জানতে চাননি। কথা বলতে-বলতে হঠাৎ থেমে গেলেন দীপকাকু। ঝিনুককে বললেন, "কী হল, তুমি আমার সঙ্গে আসছ কেন! ডেকে দেব ট্যাক্সি?"

"না, থাক। আমি ডেকে নিচ্ছি।" বলে ফুটপাতে দাঁড়িয়ে পড়ল ঝিনুক। ভীষণ ইচ্ছে করছে দীপকাকুর সঙ্গে যেতে। ফরেনসিক ল্যাবের কাজটা নাকি ভীষণ বোরিং। দীপকাকু কখনওই নিয়ে যেতে চান না।

অনেকটা দূর এগিয়ে গিয়েছেন দীপকাকু। মানুষের আড়ালে পড়ে যাচ্ছেন। জানা হল না, আবার কখন যোগাযোগ হবে। এই সময়ই ঝিনুকের খেয়াল হয়, রেস্তরাঁর চিরকুটটা এখন তার কাছে। এটাই কেসটার সঙ্গে ঝিনুকের যোগসূত্র রাখবে। চিরকুটটা পকেট থেকে বের করে ঝিনুক। পড়তে থাকে, দু'টো প্রশ্ন খুব বড় হয়ে দেখা দিচ্ছে। এক, ডবল টাকা দিতে চাইছে, মানে অ্যারো কোম্পানির সঙ্গে দীপকাকুর কত টাকার কন্ট্রাক্ট হয়েছে জানে। দুই, চিঠিটা বহুবচনে লেখা। 'আমরা' অর্থাৎ অপরাধী একজন নয়, অনেকজন।

ফুটপাত ঘেঁষে একটা ট্যাক্সি এসে দাঁড়ায়। ড্রাইভার জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বলে, "ম্যাডাম, টালিগঞ্জ যাবেন তো? চলে আসুন।"

ঝিনুক বেশ থতমত খেয়ে গেল, ড্রাইভার কি তাকে সিরিয়াল বা সিনেমার অভিনেত্রীর সঙ্গে গুলিয়ে ফেলছে? স্টুডিওগুলো সব টালিগঞ্জে।

ধন্ধ কাটিয়ে দিল ড্রাইভার। বলল, "বাইকে এক বাবু যাচ্ছিলেন, উনিই বললেন, আপনি টালিগঞ্জ যাবেন।" ঝিনুক এখন বাড়ি ফিরবে একমাত্র দীপকাকুই জানেন। তার মানে উনিই পাঠিয়ে দিয়েছেন ট্যাক্সি। নিশ্চিন্তে গিয়ে বসে ঝিনুক।

॥ ৪ ॥

সুজয় ঘোষের আদি বাড়ি যোধপুর পার্কে। সেই বাড়ি থেকে খানিক দূরে এখন একটা ফ্ল্যাটে থাকেন। ফ্যামিলি মেম্বার, স্ত্রী, এক ছেলে, এক মেয়ে। ছেলে হোটেল ম্যানেজমেন্ট পড়ে বছরদু'য়েক চাকরিতে ঢুকেছে। মেয়ে যাদবপুরে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ছে। পরিবারে একে অপরের সঙ্গে সম্পর্ক ভাল। সুজয়বাবু যে ইদানীং কোনও ব্যাপারে খুব চিন্তায় আছেন, বাড়ির লোক বুঝতে পারছে। প্রশ্ন করে কোনও উত্তর পায়নি।

একই পাড়ায় থাকেন গৌতম মজুমদার। পৈতৃক বাড়ি। পরিবারে পাঁচজন, বৃদ্ধ বাবা-মা এবং স্ত্রী, এক মেয়ে। মেয়ে স্কুলে শিক্ষকতা করে। গৌতমবাবুর কোনও মানসিক পরিবর্তন বাড়ির লোকের চোখে পড়েনি। নিজের কাজের জগতের খবর গৌতমবাবু কখনওই বাড়িতে নিয়ে আসেন না।

পার্থ বর্মন থাকেন পাশের পাড়ায়, পোদ্দারনগরে। শরিকি বাড়ি। সংসার বলতে দুই ভাই। দু'জনেই বিয়ে-থা করেননি। বড় ভাই কলেজে পড়ান। নিজের পড়াশোনা নিয়ে থাকেন। রাতদিনের বৃদ্ধ কাজের লোক দু'ভাইয়ের দেখাশোনা করে। টানা তথ্যগুলো দিয়ে থামলেন দীপকাকু। ঝিনুক লিখে নিচ্ছে নোটবুকে। ব্রেকফাস্টের প্লেট সেন্টার টেবিল থেকে তুলে দীপকাকু মায়ের উদ্দেশে বললেন, "এত লুচি কেন দিলেন বউদি? দুপুরে খিদে পাবে না।"

এটা কথার কথা, মা ভাল করেই জানেন। আরও চারটে নিয়ে আসবেন একটু পরে। অবলীলায় খেয়ে নেবেন দীপকাকু। সকালে ফোন করেছিলেন, "বউদি, ঘণ্টাখানেকের মধ্যে আসছি। জলখাবারটা আপনার কাছেই সারব।"

কাউকে খাওয়ানোর সুযোগ পেলে মা যেন বর্তে যান। বিশেষ করে দীপকাকুকে। তিনি নাকি রান্নার প্রকৃত সমঝদার। ঝিনুকও লক্ষ করেছে, রান্না নিয়ে দীপকাকু মায়ের সঙ্গে অন্তত আধঘণ্টা দিব্যি আলোচনা চালিয়ে যেতে পারেন। ম্যারিনেট, বেকিং থেকে ফোড়ন পর্যন্ত। ঝিনুক তো চার-পাঁচটার বেশি মশলার নামই জানে না।

আজ লুচির সঙ্গে নতুন পদ মটর-বেগুন। ভূয়সী প্রশংসা করে খেয়ে যাচ্ছেন দীপকাকু। বাবা শেভ করতে-করতে টিপ্পনি কাটলেন, "দ্যাখো দীপঙ্কর, তোমার অত ভাল-ভাল কেরার আসল কারণটা আমরা বুঝি।"

"কী কারণ?" খেতে-খেতেই জানতে চাইলেন দীপকাকু।

"এ-বাড়ির রেট অফ নিমন্ত্রণটা যেন বাড়ে।"

"সরি রজতদা, আমার সেরকম কোনও ইন্টেনশন নেই। আমি

boierpathshala.blogspot.com

সর্বদাই বোঝাতে চাই, রান্না হচ্ছে এক উন্নতমানের শিল্প। রন্ধন শিল্প। যারা সেটা...”

আরও কত কী বলে যাচ্ছেন দীপকাকু, ঝিনুকের সেদিকে মন নেই। সদ্য নোট করা অক্ষরে চোখ বোলাতে-বোলাতে কল্পনা করছে, তিন পার্টনারের বাড়ির পরিবেশ। রাগ হচ্ছে দীপকাকু তাকে নিয়ে যাননি বলে।

কাল রেস্তরাঁ থেকে বেরিয়ে দীপকাকু সেই যে উধাও হলেন, যোগযোগ হল আজ সকালে। মাঝে ফোনেও পাওয়া যায়নি। গতকাল ফরেনসিক ল্যাবের কাজ সেরে দীপকাকু গিয়েছিলেন তিন পার্টনারের বাড়ি। উদ্দেশ্য, বাড়ির লোকেরা ব্যবসার সাম্প্রতিক সমস্যা নিয়ে কিছু জানে কিনা। আলোচনা করে বোঝা গিয়েছে, কিছুই জানে না তারা। তার মানে তিনবন্ধু মিথ্যে বলেননি, ব্যবসা সংক্রান্ত কোনও আলোচনাই তাঁরা বাড়িতে করেন না। ফ্যামিলি মেম্বারদের কেস হিস্ট্রি জেনে দীপকাকুর মনে হয়েছে, বিজনেসের ক্ষতি করার কোনও অভিপ্রায় তাদের থাকার কথা নয়। তিন পার্টনারের সেরকম নিকট বন্ধুও নেই যে, নিয়মিত ব্যবসা নিয়ে আলোচনা করবেন। অর্থাৎ যা দাঁড়াল, খবর ফাঁস হচ্ছে তিনজনের মধ্যে থেকেই।

তদন্তে নেমে দীপকাকু এখন পর্যন্ত তেমন এগোতে পারেননি। রেস্তরাঁয় যে অজ্ঞাত পরিচয় লোকটা চিঠি দিয়েছিল, তার হাতের ছাপ সংগ্রহ হয়েছে। সেটা আদৌ কতটা কাজে লাগবে বোঝা যাচ্ছে না। এই কেসটায় কেন জানি দীপকাকুকে একটু গা-ছাড়া লাগছে।

মা লুচি নিয়ে এলেন, “আর দু'টো দিই দীপঙ্কর?”

“না না, আর নয়।” বলে ফিরিয়ে দিলেন দীপকাকু। বাবা এসে বসলেন সোফায়। দীপকাকুকে বললেন, “তোমার এই কেসটা তেমন চার্মিং নয়। পুলিশের ইনভলভমেন্ট নেই। কাউকে অনুসরণ করার ব্যাপার নেই। অ্যাকশন, ফাইটিং...”

বাবার কথা শেষ হওয়ার আগে দীপকাকু বলেন, “দু'টো গ্রেটিনিং লেটার আছে।”

সঙ্গে-সঙ্গে পয়েন্টটা লুফে নেয় ঝিনুক। বলে, “লাস্ট চিঠিতে দু'টো ব্যাপার লক্ষ করেছি আমি। কেস ছেড়ে দিলে ডবল টাকা দেবে বলছে। আপনার সেটেল্ড অ্যামাউন্ট ওরা তার মানে জানে।”

“না-ও জানতে পারে। হয়তো আমাকে জিজ্ঞেস করে নেবে।” বললেন দীপকাকু।

“সেকেন্ড পয়েন্ট, চিঠিতে লিখছে 'আমরা', তা হলে কি ধরে নেব, তিন পার্টনারের মধ্যে দু'জন মিলে এই কাজটা করছেন?”

উত্তর না দিয়ে প্লেট হাতে উঠে গেলেন দীপকাকু। ঘরের বাইরে বেসিনের কাছে গিয়ে রাখবেন। নিজের কাজ নিজের হাতে করতেই পছন্দ করেন।

মা কিচেন থেকে বলেন, “তোমাদের দেব খেতে?”

“দাও।” বললেন বাবা।

রুমালে মুখ মুছতে-মুছতে দীপকাকু সোফায় এসে বসলেন। আগের প্রশ্নের রেশ টেনে বললেন, “‘আমরা’ কথাটা আমাদের ঠকানোর চেষ্টা হতে পারে। একটা জিনিস খেয়াল রেখো, অন্য পাঁচটা কেসের তুলনায়, এটা অনেক জটিল। অপরাধী যথেষ্ট বুদ্ধিমান। শুধু একটাই দুর্বলতা, বারবার হুমকি দিতে হচ্ছে আমাদের। এতেই প্রমাণ হয়, আমাদের তদন্ত সঠিক রাস্তায় চলছে, অপরাধীও আমাদের চেয়ে খুব দূরে নেই। আমরা যে পদ্ধতিতে কাজ চালিয়ে যাচ্ছি, সেভাবেই যাব।”

“ঝিনুক প্লেটগুলো নিয়ে যা।” রান্নাঘর থেকে ভেসে এল মায়ের গলা।

সোফা ছেড়ে উঠে ঝিনুক দীপকাকুকে বলে, “আমরা তা হলে এখন ডাঃ অজিত রায়ের নার্সিং হোমে যাচ্ছি?”

“হ্যাঁ। তারপর দরকার মনে করলে লোটাস এবং আর্টলাইনের মালিকের কাছেও যাব। কোন রাস্তায় তারা জোগাড় করছে অ্যারোর কনসেপ্ট, সেটা বের করতেই হবে। যদিও জানি, অপরাধী কখনওই হ্যান্ড টু হ্যান্ড অ্যারোর আইডিয়া ওদের দিচ্ছে না। লুকিয়ে রেখেছে

pathagar.net

boierpathshala.blogspot.com

নিজেকে।"

আবার ডাক দেন মা। ঝিনুক তাড়াতাড়ি কিচেনের দিকে দৌড়য়।

খাবারের প্লেট হাতে ঝিনুক ঘরে এসে দ্যাখে, দীপকাকু নিজের সেলফোনে কার সঙ্গে যেন কথা বলছেন। ঝিনুকদের বাড়ি আসতে হলে, কী রুটে আসবেন, বুঝিয়ে দিলেন সেটাই।

ঝিনুক জিজ্ঞেস করে, "কে?"

"দশ মিনিটের মধ্যেই জানতে পারবে।" বলে, ফোনসেট বুক পকেটে রেখে উঠে দাঁড়ালেন দীপকাকু। মুখে গাঢ় চিন্তার ছাপ। পায়ে-পায়ে এগিয়ে গেলেন সেল্‌ফের কাছে। রুবিক কিউবটা তুলে নিয়ে ফিরে এলেন সোফায়। ট্রাই করে যাচ্ছেন রং মেলানোর। খুব জানতে ইচ্ছে করছে, কে আসছেন? নিজেকে সংযত রেখেছে ঝিনুক। প্রশ্ন করলে চিন্তার ব্যাঘাত হবে দীপকাকুর। বাবাও চুপ করে আছেন। মিনিট দশেকের মধ্যে তো জানা যাবেই, অতিথিটি কে? খাবারের প্লেটে মন দেয় ঝিনুক।

কুড়ি মিনিট পরে ডোরবেল বাজে। ততক্ষণে ঝিনুকদের জলখাবারের পাট শেষ। দরজা খুলতে যায় ঝিনুক। সম্ভাব্য অতিথি হিসেবে অনেকের নাম ভেবে রেখেছিল। দরজা খোলার পর ঝিনুক দেখল, তাদের কেউ নয়। দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে আছেন তিন পার্টনারের একজন। গৌতম মজুমদার। চেহারায় কেমন যেন উদ্‌ভ্রান্ত ভাব। জিজ্ঞেস করলেন, "দীপঙ্কর বাগচী আছেন তো?"

"আছেন। ভিতরে আসুন।" সরে দাঁড়ায় ঝিনুক।

জুতো না খুলেই গৌতমবাবু তড়িঘড়ি পায়ে দীপকাকুর মুখোমুখি সোফায় গিয়ে বসেন। বাবার উপস্থিতি খেয়ালই করছেন না। আকুল আগ্রহে দীপকাকুকে বলেন, "সব শুনে কী মনে হল আপনার?"

"ফোনে আপনি ভীষণ র‍্যাপিডলি কথা বলছিলেন, পুরোটা বুঝতে পারিনি। ঠান্ডা মাথায় গোড়া থেকে বিষয়টা বলুন।"

ঝিনুক জানে দীপকাকু ফোনের কথা সমস্তটাই শুনেছেন এবং বুঝেছেন। এতক্ষণ চিন্তা করে গিয়েছেন ওই নিয়েই। আবার শুনতে চাওয়ার উদ্দেশ্য, বিষয়টা খতিয়ে দেখা। ঘরের চারপাশে চোখ বুলিয়ে শুরু করলেন গৌতমবাবু, "এক ক্লায়েন্টের কাছে আমাদের তিন লাখ টাকা পাওনা। অনেক দিন ধরে আটকে রেখেছে টাকাটা। আমার উপর দায়িত্ব ছিল পেমেন্টটা তোলার। পার্টিকে রেগুলার এস এম এস করে তাগাদা দিয়ে যাচ্ছিলাম আমি। ক্লায়েন্ট বলে যাচ্ছে, পঞ্চাশ হাজার কমাতে। এক পয়সাও কম করতে রাজি হইনি। আজ সকালে পার্টি আড়াই লাখ টাকার চেক সুজয়ের বাড়িতে গিয়ে দিয়ে আসে। সুজয় জানতে চায়, পঞ্চাশ কম কেন?

"পার্টি নিজের মোবাইল ফোনে একটা এস এম এস দেখায়, 'ঠিক আছে, পঞ্চাশ কম দিন। সুজয় ঘোষের বাড়িতে দেবেন।' এস এম এসটা পাঠানো হয়েছে আমার সেলফোন থেকে।"

"কী করে?" ঝিনুকের প্রশ্নটা দীপকাকুই করেন।

গৌতমবাবু বলেন, "সেটাই তো আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছি। এই এস এম এস আমি করিনি। করার প্রশ্নই ওঠে না। এদিকে সুজয় পেমেন্ট রিসিভ করেছে। দোষ নেই ওর। এস এম এস সেন্ডারে আমার নাম, নম্বর। ক্লায়েন্ট ওর সামনে থেকে চলে যাওয়ার পর আমাকে ফোন করে জানতে চায়, কেন কমালাম টাকাটা। খুব পোলাইটভাবেই জিজ্ঞেস করেছিল। পাছে কিছু মনে করি। মালিক হিসেবে ছোট একটা ডিসিশন নিতেই পারি আমি। সুজয়ের কথা শুনে আমি তো আকাশ থেকে পড়লাম। পেমেন্ট নিয়ে টালবাহানাটা ক্লায়েন্ট আর আমরা তিন পার্টনার ছাড়া বাইরের কেউ জানে না। এস এম এস গিয়েছে আমার ফোন থেকে, আর্থাৎ আমি দোষী। কোম্পানির পঞ্চাশ হাজার টাকা লস। সব শুনে সুজয় বলল, আপনার সঙ্গে দেখা করতে।"

"হুম!" শব্দ করে খানিকক্ষণ নীরব থাকলেন দীপকাকু। একটু পরে জানতে চাইলেন, "সেলফোনটা কোন-কোন সময় আপনি কাছছাড়া করেন?"

"বাড়িতে বাথরুমে যাওয়ার সময়। রাতে ঘুমোতে গেলে বালিশের পাশেই থাকে। বাড়ির লোক আমার ব্যক্তিগত ব্যাপারে নাক গলায় না।"

"জানি। কাল আপনার ফ্যামিলি মেম্বারদের সঙ্গে কথা বলে আমার সেরকমই মনে হয়েছে।" বলে আবার চুপ করে গেলেন দীপকাকু। এবার বাবা জানতে চাইলেন, "ফোনসেট আপনি সব সময় পকেটেই রাখেন?"

বাবার সঙ্গে গৌতমবাবুর এখনও আলাপ হয়নি। উত্তর দেবেন কিনা ভাবছেন। দু'জনের মধ্যে পরিচয় করিয়ে দিলেন দীপকাকু। নমস্কার বিনিময়ের পর গৌতমবাবু বলেন, "জেনারেলি পকেটেই থাকে। যখন মিটিংয়ে থাকি, সাইলেন্ট মোড করে সেটটা রাখি টেবিলে, চোখের সামনে।"

"কাল কত বার এরকম রাখতে হয়েছে?" জানতে চাইলেন দীপকাকু।

"দু'বার। আপনারা চলে যাওয়ার পর তিন বন্ধু মিটিংয়ে বসেছিলাম, সেকেন্ড মিটিং কফিশপে, লোটাস আর আর্টলাইনের মালিকের সঙ্গে।"

"ওদের সঙ্গে মিটিংয়ে বসেছিলেন কেন? ওরা তো শত্রুতা করছে।"

"আলাপ, আলোচনার মাধ্যমে যদি ব্যাপারটা সামলানো যায়।"

"বাকি দু'ই কোম্পানির মালিককে ডাকেননি কেন? চিত্রা, রূপরেখা?"

"রূপরেখার মালিক সুবিধের নয়, আপসে যাবেই না। আমাদের এজেন্সির উপর ভীষণ রাগ। ওর অনেক ক্লায়েন্ট আমাদের কাছে চলে এসেছে। সেটা আমাদের কাজের কোয়ালিটি দেখেই।"

"আর চিত্রার মালিক?"

"অজিত আমাদের স্কুলবেলার বন্ধু। ও তো বলেই দিয়েছে, আর কখনও কোনও কনসেপ্ট অসৎ পথে কিনবে না। অ্যাকচুয়ালি অজিতের এজেন্সিটা পুরোপুরি শখের। ওকে নিয়ে আমাদের চিন্তা নেই।"

ঘরের চারজনই এখন চুপ। ঝিনুকের হঠাৎ চোখ পড়ে, মা ট্রে নিয়ে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছেন। উঠে গিয়ে চায়ের ট্রে নেয় ঝিনুক। সেন্টার টেবিলে এনে রাখে। ঝিনুক চা খায় না। বড়রা যে যার কাপ তুলে নিয়েছেন। কাপে চুমুক দিয়ে দীপকাকু বলে ওঠেন, "আমি আপনাদের কেসটা ছেড়ে দিচ্ছি!"

সিদ্ধান্তটা এত আকস্মিক, বাবার কাপ থেকে চা চলকে পাঞ্জাবিতে পড়ে গেল। গৌতমবাবুও ভীষণ অবাক হয়েছেন। অসহায় কণ্ঠে জানতে চান, "হঠাৎ এরকম ডিসিশন নেওয়ার কারণ?"

গলাটা একটু ঝেড়ে নিয়ে দীপকাকু বলতে থাকেন, "তদন্তের ভার আমার উপর দিয়ে খুব একটা নিশ্চিন্ত হননি আপনারা। তাই শত্রুপক্ষের সঙ্গে আপস রফায় বসছেন। এতে আমার তদন্তের ক্ষতি হচ্ছে। আমি সেই কেস নিই না, যেখানে ক্লায়েন্ট আমার উপর সম্পূর্ণ ভরসা করতে পারে না।"

গৌতমবাবু ভীষণ অপ্রস্তুত হয়ে পড়েছেন। বলতে থাকেন, "সরি, এক্সট্রিমলি সরি। আমরা ব্যাপারটা এত খতিয়ে ভাবিনি। দোষ আমাদের। আর এরকম হবে না। আপনি প্লিজ কেসটা ছাড়বেন না।"

দীপকাকুকে ভজানোর আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছেন গৌতমবাবু। দীপকাকু একই রকম গম্ভীর। ঝিনুকের টেনশন বাড়ছে, যদি সত্যিই তদন্তের ভার ছেড়ে দেন, অনেক কিছু অজানা থেকে যাবে। খুবই ইন্টারেস্টিং পর্যায়ে এসে গিয়েছে কেসটা।

নীরবতা ভেঙে দীপকাকু বলে ওঠেন, "খুব মন দিয়ে ভাবুন তো, কাল কোন-কোন সময় ফোনসেটটা আপনার একদম চোখের বাইরে ছিল।"

ঘরের বাকি তিনজন চনমনে হয়ে ওঠেন। কেস তার মানে ছাড়েননি। ঝিনুক মনে-মনে বলে, রহস্য তেমন জম্পেশ হলে, প্রকৃত গোয়েন্দার কাছে মান-অভিমান সব তুচ্ছ হয়ে যায়।

গৌতমবাবু চোখ বন্ধ করেছেন। দীপকাকুর নির্দেশমতো মন দিয়ে ভাবছেন। একটু পরে চোখ খুলে বলেন, "যতদূর মনে পড়ছে বলছি।

boierpathshala.blogspot.com

দু'টো মিটিংয়ে আমি একবার করে টয়লেটে যাই। ফোনসেট পড়েছিল টেবিলে। অফিস থেকে বেরিয়ে অজিতের চেম্বারে গিয়েছিলাম ব্লাডপ্রেশার চেক করাতে। প্রত্যেক মাসে একবার যাই। বুকপকেট থেকে সেলফোন সমেত কাগজ, পেন অজিতের টেবিলে রেখে, পাশের বেডে শুয়েছিলাম।"

"প্রেশার মাপা হবে হাতে, বুক পকেট খালি করতে হল কেন?" জানতে চাইলেন দীপকাকু।

"স্টেথো দিয়ে বুক, পিঠ পরীক্ষা করে তো, অসুবিধে হবে বলে জিনিসগুলো বাইরে রেখেছিলাম।"

"ফাইন! তারপর বলুন।" বললেন দীপকাকু।

গৌতমবাবু বলতে থাকেন, "চেম্বার হয়ে আমি গিয়েছিলাম একটা সেলুনে। আমাদের পাড়ার সেলুন। চুল কেটে মাথা ম্যাসাজ করে দিয়েছিল সনাতন। সেই সময় মিনিট দশকের মতো ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। বাড়ি ফিরে স্নান করি। ফোনসেট ছিল লিভিংরুমে। ঘুমোতে যাই অন্যান্য দিনের মতোই বালিশের পাশে ফোন নিয়ে।"

এতক্ষণ ভ্রু কুঁচকে সব কথা শুনলেন দীপকাকু। ভ্রু-জোড়ার পজিশন একই জায়গায় রয়ে গেল। বললেন, "তা হলে যা দেখা যাচ্ছে, অনেকেরই সুযোগ ছিল আপনার ফোন থেকে এস এম এস করার। অথচ আপনি অবাক হচ্ছিলেন, কী করে আপনার ফোন থেকে মেসেজটা গেল!"

মৃদু প্রতিবাদের সুরে গৌতমবাবু বলেন, "সে না হয় মানলাম। কিন্তু কথা হচ্ছে, যাদের সামনে ফোনসেট রেখে গিয়েছিলাম, তারা কী করে বাকি থাকা পেমেন্টের কথাটা জানবে?"

"জানতেই পারে। আপনাদের কাছে ডিউ রাখা কাস্টমার হয়তো তলে-তলে অনেকের সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছে।"

দীপকাকুর কথাটা ফেলে দিতে পারলেন না গৌতমবাবু। কী একটু চিন্তা করে নিয়ে বললেন, "আপনার কী মনে হয়, কোনও একজন নয়, কয়েকজন মিলে আমাদের কোম্পানির এগেনস্টে ষড়যন্ত্র করছে?"

"এখনই ঠিক বলা যাচ্ছে না। তবে এটুকু বোঝা যাচ্ছে, আপনি যাদের সামনে ফোনসেট রেখে গিয়েছিলেন, তাদের মধ্যে কেউ একজন এস এম এসটা পাঠায়। অবশ্য আমি কিন্তু আপনাকেও সন্দেহের বাইরে রাখছি না।"

"আমি!" চমকে উঠে বিস্ময়ে বলে ওঠেন গৌতমবাবু।

"হ্যাঁ, আপনি। কেননা, আপনারাই বলেছেন, তিন পার্টনারের মধ্যে একজন অপরাধী।"

ঠোঁটের কোণে বাঁকা হাসি এনে গৌতমবাবু বলেন, "আমাকে দেখে কি আপনার এতই বোকা মনে হয়? নিজের সেলফোন থেকে মেসেজ পাঠিয়ে নিজেকে ধরা দিয়ে দেব!"

"এটাই হয়তো আপনার চালাকি। এত বোকামি আপনাকে মানায় না! তিন বন্ধুর মধ্যে থেকে সন্দেহের বাইরে চলে গেলেন আপনি।"

দীপকাকুর অ্যানালিসিস পছন্দ হয়নি গৌতমবাবুর। না হওয়ারই কথা। গোঁজ মেরে বসে আছেন।

সান্ত্বনার ঢঙে দীপকাকু বলেন, "দেখুন, আমাকে ভুল বুঝবেন না। আমাদের কাজের প্রাথমিক শর্ত হচ্ছে, পাত্রপাত্রী নির্বিশেষে সন্দেহ করা। আমি আমার ডিউটি করছি মাত্র।"

বড় করে শ্বাস ছেড়ে গৌতমবাবু বলেন, "যা যা ঘটেছে, সব কিছু বলে, আমি আমার কাছে সৎ থাকলাম। এবার আপনার কাজ আপনি করুন। এখন উঠি।"

"আমরাও উঠব।" বললেন দীপকাকু।

"কোথায় যাবেন? আমার সঙ্গে গাড়ি আছে। লিফ্‌ট দিতে পারি।"

"নো, থ্যাঙ্কস। আমার বাইক আছে। অনেক জায়গায় ঘুরতে হবে। প্রথমে যাব আপনাদের ডাক্তার বন্ধুর চেম্বারে। আজকের কাজ ওখানেই শেষ হয়ে যেত। আপনি যে ঘটনা নিয়ে এলেন, লোটাস, আর্টলাইনের মালিকের সঙ্গেও দেখা করতে হবে। তারপর যাব আপনার পাড়ার সেলুনে।"

কথার পিঠে গৌতমবাবু বলেন, "সনাতনকে আপনি সন্দেহের বাইরে রাখতে পারেন। ও ব্যাটা লেখাপড়াই জানে না, এস এম এস করবে কী করে?"

"সনাতনকে না হয় সন্দেহের বাইরে রাখলাম, আপনার পাশের সিটে যে লোকটা চুল কাটাচ্ছিল, সে ও তো..."

দীপকাকু কথা শেষ করেননি, গৌতমবাবুর চোখে-মুখে চকিতে ভয় খেলে গেল। যেন এখনও বসে আছেন সেলুনে। বললেন, "শত্রু কি তা হলে আমাদের ছায়া অনুসরণ করছে?"

"হতেও পারে।" বলে গম্ভীর হয়ে গেলেন দীপকাকু।

ঝিনুক পায়ে-পায়ে ভিতরবাড়িতে যায়। বেরনোর আগে সামান্য প্রসাধন সেরে নিতে হবে। জিনস, টপ অনেক আগে থেকে পরা আছে।

আলিপুরে ঢুকে বাইক থামিয়ে দিলেন দীপকাকু। অবাক হয় ঝিনুক। দীপকাকু বলেন, "নেমে যাও!"

সিট থেকে নেমে আসতে-আসতে ঝিনুক জানতে চায়, "গাড়ির কোনও প্রবলেম?"

লুকিং গ্লাসে চোখ রেখে দীপকাকু বলেন, "পিছনে যে মিনিবাসটা আসছে উঠে পড়বে। বলবে, সেন্ট জোসেফ স্কুল যাব। স্কুলের উলটো দিকের গলিতে রিপোজ অন নার্সিং হোম। আমি ভিতরে ডাঃ অজিত রায়ের সঙ্গে কথা বলব। তুমি বাইরে দাঁড়িয়ে বাইকটা লক্ষ রাখবে। কেউ চিরকুট রাখতে এলে হাতনাতে ধরবে।"

দ্রুত কথা শেষ করে বাইক স্টার্ট দিলেন দীপকাকু। মিনিবাস এসে পড়েছে সামনে। হাত দেখিয়ে দাঁড় করায় ঝিনুক, উঠে পড়ে।

দীপকাকুর কথামতো ঝিনুক পৌঁছে গিয়েছে নার্সিং হোমের সামনে। দাঁড়িয়ে আছে উলটো দিকের ফুটপাতে পার্ক করা গাড়ির আড়ালে। এত নিখুঁত পথনির্দেশ দিয়েছেন দীপকাকু, মনে হচ্ছে ঘুরে গিয়েছেন একবার। এখান থেকে দেখা যাচ্ছে নার্সিং হোমের বিশাল গেট। খোলাই আছে গেটটা। সামনে টুলের উপর বসে আছে সিকিউরিটির লোক। ভিতরে কোর্ট ইয়ার্ড বেশ বড়, ইতস্তত গাড়ি, যার মধ্যে দীপকাকুর লাল বাইকটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

এই ফুটপাতে লোক চলাচল কম! হঠাৎ কোনও পথচারীকে দেখলে ঝিনুক এমন ভঙ্গিতে সামনের ব্যালিনো গাড়িতে ঠেস দিচ্ছে, যেন নিজের গাড়ি। ড্রাইভার আশপাশে কোথাও গিয়েছে।

চোখে সানগ্লাসটা পরে নিয়েছে ঝিনুক। চশমাটা হ্যান্ডব্যাগেই থাকে। দীপকাকুর সামনে পরে না। বড়দের সামনে সানগ্লাস পরাটাকে ঔদ্ধত্য দেখানো মনে হয়। এখন পরেছে নিজেকে লুকোতে। চিরকুট রাখে যে লোকটা, ঝিনুককে অবশ্যই চেনে। সানগ্লাসে যদি একটু অপরিচিত থাকা যায়।

রিস্ট উলটে ঘড়ি দ্যাখে ঝিনুক, দশ মিনিটও হয়নি দাঁড়িয়ে আছে, মনে হচ্ছে একঘণ্টা। এখন ভিজিটিং আওয়ার্স নয়। নার্সিং হোমের গেটে মানুষের আনাগোনা নেই। দু'টো গাড়ি ঢুকেছে মাত্র।

নার্সিং হোমের বাড়িটা ভাল করে নজর করে ঝিনুক, উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা তিনতলা বিশাল বাড়ি। সবটা জুড়ে নার্সিং হোম হয়তো নয়, বাড়ি লাগোয়া গলিতে আর-একটা গেট আছে। ডাক্তারবাবুর রেসিডেন্স মনে হয় এটাই। ওঁর অ্যাড এজেন্সি চিত্রা কি এখানেই? ভাবতে-ভাবতে ঝিনুকের দৃষ্টি থমকায় নার্সিং হোমের গেটে। জিনস, ঢোলা সাদা জামা পরা একটা লোক গটগট করে হেঁটে যাচ্ছে। সিকিউরিটিম্যান তার দিকে ফিরেও তাকাল না।

ঝিনুক সতর্ক হয়। গাড়ির আড়াল থেকে বেরিয়ে রাস্তায় আসে। হ্যাঁ, যা আশঙ্কা করেছিল তাই। লোকটা এগিয়ে যাচ্ছে দীপকাকুর বাইক লক্ষ্য করে।

হরিণ পায়ে রাস্তা ক্রস করে ঝিনুক। দীপকাকুর বাইকের সামনে গিয়ে দাঁড়াল লোকটা। আশপাশটা একবার দেখল। ঝিনুক স্টেপ বাই স্টেপ এগোতে থাকে। যখনই লোকটা ঝুঁকেছে বাইকের উপর, প্রচণ্ড স্পিডে দৌড়ে ঝিনুক ঝাঁপিয়ে পড়ে লোকটার উপর। শার্টের কলার ঝিনুকের মুঠিতে, এক হ্যাঁচকায় লোকটাকে মাটিতে ফেলে দেয় ঝিনুক।

boierpathshala.blogspot.com

ভীষণ হতভম্ব হয়ে গিয়েছে মানুষটা। হাতে কীসব কাগজপত্তর ছিল, ছড়িয়েছিটিয়ে একশা। লোকটা এতটাই অবাক হয়েছে, মুখ থেকে কথা বেরোচ্ছে না। নয়-নয় করে পঁচাত্তর কেজি তো হবেই। এই পুঁচকে মেয়েটা কী করে তাকে ধরাশায়ী করে দিল!

লোকটার সামনে দাঁড়িয়ে বড় নিশ্বাস ফেলতে-ফেলতে ঝিনুক জিজ্ঞেস করে, "কী করছিলেন গাড়ির সামনে?"

"কিছু না। হ্যান্ডবিল দিচ্ছিলাম।"

'হ্যান্ডবিল' কথাটা রিপিট করে একটু থমকায় ঝিনুক। লোকটার চারপাশে ছড়িয়ে থাকা কাগজগুলো লক্ষ করে দ্যাখে, সত্যিই কোনও বিজ্ঞাপনের লিফলেট কিনা। কীসের অ্যাড, এত দূর থেকে বোঝা যাচ্ছে না।

লোকটা বসেই আছে ঘাস-ধুলোর উপর। ঝিনুক বোঝে, মস্ত ভুল হয়ে গিয়েছে তার। চোখের কোণ দিয়ে দেখতে পায়, আশপাশ থেকে জনাকয়েক এগিয়ে আসছে অকুস্থলে। মেজাজ বজায় রাখে ঝিনুক, "এত গাড়ি থাকতে আপনি বেছে-বেছে আমাদের বাইকে কাগজটা রাখতে আসছিলেন কেন?"

নিরীহ কণ্ঠে লোকটা বলে, "অন্য গাড়িতেও রাখতাম।"

সিকিউরিটি গার্ড ঝিনুকের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। জিজ্ঞেস করে, "কী হয়েছে দিদিমণি?"

ঝিনুক কিছু বলতে যাবে, সামনে এসে দাঁড়ানো সাদা শাড়ির নার্স বলে উঠলেন, "তুমি হঠাৎ ওকে মারতে শুরু করলে কেন?"

বিস্মিত গলায় ঝিনুক বলে, "আমি মারলাম কখন?"

পাশে আর-একটি লোক বলে উঠল, "মারার চেয়ে কী কম করেছ তুমি?"

গার্ড আবার জিজ্ঞেস করে, "আপনার কি কোনও পেশেন্ট আছে এখানে?"

"না।"

"তা হলে এখানে কী করছ তুমি?" জানতে চাইলেন নার্স।

ঝিনুক এবার একটু নার্ভাস ফিল করে। কী উত্তর দেবে ঠিক করে উঠতে পারছে না। নার্সের প্রশ্ন চলে যায় গার্ডের মুখে, "বলুন, এখানে কেন এসেছেন?"

"আমি, মানে আমার কাকা..." বলতে-বলতেই ঝিনুক দ্যাখে, দীপকাকু নেমে আসছেন বারান্দার সিঁড়ি বেয়ে।

ধড়ে প্রাণ এল। ডাক্তারবাবুর সঙ্গে কথায় যতই ব্যস্ত থাকুন, কান ছিল বাইরে। অর্থাৎ খেয়াল ছিল ঝিনুকের প্রতি। জটলার কাছে এসে দীপকাকু জানতে চান ঘটনাটা। উপস্থিত লোকজন যে-যার নিজের মতো বলতে থাকে। ঝিনুকের কপালটা ভাল, হেনস্তা হওয়া লোকটা গোবেচারা প্রকৃতির। মাঠ থেকে উঠে ছড়িয়ে থাকা লিফলেটগুলো কুড়িয়ে নিচ্ছে।

দীপকাকু আপাতত সাফাই দিচ্ছেন ঝিনুকের হয়ে, "আসলে ক'দিন আগে আমার বাইকের কিছু ক্ষতি করে একটা অজানা লোক। বাইকটা আমার ভাইঝির খুব প্রিয়। ও ভেবেছিল, আজও হয়তো ওরকম কিছু একটা ঘটতে চলেছে।"

প্রতিবাদীরা মোটামুটি কনভিন্সড। ফিরে যাচ্ছে যে-যার কাজে। দীপকাকু এগিয়ে যান হ্যান্ডবিলওলার কাছে। পিঠে হাত রাখেন। ঝোঁকা অবস্থা থেকে চমকে সোজা হয় লোকটা। হাত থেকে খসে যায় দু'টো-একটা লিফলেট। দীপকাকু বলেন, "আমি খুবই দুঃখিত। কিছু মনে করবেন না। ছেলেমানুষি বুদ্ধিতে একটা কাণ্ড করে বসেছে।"

"না না, ঠিক আছে। আমি কিছু মনে করিনি।" বলে লোকটা মানে-মানে কেটে পড়ে। ঝিনুক গোপনে স্বস্তির নিশ্বাস ফ্যালে।

দীপকাকু পায়ের কাছে পড়ে থাকা একটা লিফলেট কুড়িয়ে নিয়েছেন। দেখছেন কীসের বিজ্ঞাপন। ঝিনুক সামনে গিয়ে বেশ অবাক হয়, দীপকাকু লিফলেটটা ধরেছেন উলটো, দেখছেন খুঁটিয়ে। কারণটা জিজ্ঞেস করতে যাবে ঝিনুক, দীপকাকু বলেন, "তোমার হ্যান্ডব্যাগটা খোলো তো।"

এসময় কোনও প্রশ্ন করা যাবে না। বিরক্ত হবেন। ব্যাগ খুলে সামনে দাঁড়ায় ঝিনুক। খুবই সন্তর্পণে কাগজটা ব্যাগের ভিতর রাখেন দীপকাকু। ঝিনুক ইতিমধ্যে দেখে নিয়েছে, কম্পিউটার কোম্পানির বিজ্ঞাপন আছে ওতে। দীপকাকু বলেন, "লিফলেটটা ওইভাবেই থাক, হাতটাত দিও না। ফরেনসিক টেস্ট করতে হবে।"

"কেন?"

"লোকটার পরনে জিনস। বয়স চল্লিশ। গোঁফ আছে। চশমা নেই।"

চকিতে ঝিনুকের মনে পড়ে যায় রেস্তরাঁর বয়ের দেওয়া বর্ণনা, এরকমই একটা লোক তাকে চিরকুট দিয়ে ঝিনুকদের টেবিলে পাঠিয়েছিল। ঝিনুক বলে ওঠে, "হাতের নাগালে পেয়েও লোকটাকে ছেড়ে দিলেন!"

"চেহারা, বয়সটাই শুধু মিলছে। একই লোক কিনা প্রমাণ করতে গেলে, গ্লাসের হ্যান্ডপ্রিন্ট আর লিফলেটে লাগা ধুলোর হাত-ছাপ মেলাতে হবে।"

"লোকটাকে সার্চ করলে হয়তো হুমকির চিঠি পাওয়া যেত।" আপশোসের সুরে বলে ঝিনুক।

"হুমকির চিরকুট দিতে এসে, আইওয়াশের জন্য যে হ্যান্ডবিল সঙ্গে রাখে, সে অত বোকা নয়। চিঠি ঠিক সরিয়ে দেবে, গিলেও নিতে পারে।" বলে দীপকাকু হাঁটতে থাকেন বারান্দা লক্ষ করে। অনুসরণ করে ঝিনুক।

মিটিংয়ের মাঝপথ থেকে উঠে গিয়েছিলেন দীপকাকু। চেম্বারে ঢুকতেই ডাক্তারবাবু কপাল কুঁচকে জানতে চান, "কী হয়েছিল বাইরে?"

"তেমন কিছু না। আপনি বলুন।" বলে চেয়ারে বসলেন দীপকাকু। ডাঃ অজিত রায় তাকিয়ে আছেন ঝিনুকের দিকে। দীপকাকুর খেয়াল হয়, ঝিনুকের পরিচয় দেওয়া হয়নি। বলেন, "ও হচ্ছে আমার ভাইঝি। আমাকে অ্যাসিস্ট করে।"

সৌম্যদর্শন মানুষটি ঝিনুককে নমস্কার করে বলেন, "আপনি বসুন।"

লজ্জা পায় ঝিনুক। তবে মানুষটি যে প্রকৃত ভদ্র এবং অভিজাত, বুঝতে অসুবিধে হয় না। ডাঃ রায় বলতে থাকেন, "লোকটা ফোনে আমাকে বলল, ড্রয়িং, ক্যাপশনসুদ্ধ লে-আউটটা দেশপ্রিয় পার্কের একটা গাছের তলায় রাখবে। আমি পঞ্চাশ হাজার টাকার ব্যাগটা সেখানে রেখে লে-আউট নেব। তারপর হাঁটা দেব সোজা, পিছন ফিরে দেখব না।"

"আপনি তাই করলেন?" জানতে চান দীপকাকু।

"করলাম।"

"কেন করলেন? এটা তো একটা অন্যায় কাজ।"

"জানি। কিন্তু তখন মনে হয়নি কতটা গুরুতর অন্যায়। কম্পিটিশনের খাতিরে বিজনেসে টুকটাক আনফেয়ার কাজ অনেকেই করে। সেটা যে আমার বাল্যবন্ধুদের সঙ্গে করছি, জানতাম না। অ্যাডটা পাবলিশ হওয়ার পর সুজয়রা যখন আমাকে জানাল, ওটা ওদের অ্যাপ্রুভ করা অ্যাডকপি, শুনে আমার মাথায় হাত, সঙ্গে-সঙ্গে ক্ষমা চেয়ে নিয়েছি। ঠিক করেছি, আর কখনওই ওইভাবে কোনও প্ল্যান কিনব না।"

"লোকটা আর ফোন করেনি, মানে আরও প্ল্যান কেনার জন্য?" জানতে চাইলেন দীপকাকু।

"করেনি আবার? তারপর দু'বার ফোন করে। পাত্তা দিইনি আমি।"

"ফোন নম্বরটা রেখেছেন?"

"রেখেছি। শেষবারের নম্বরটা। খোঁজ নিয়ে দেখেছি, নম্বরটা গড়িয়া অঞ্চলের একটা ফোন বুথের।"

"নম্বরটা আমাকে দিতে পারেন?"

"অবশ্যই পারি।" বলে টেবিলের ডান পাশে কাগজপত্তর, ডায়েরি হাটকাতে লাগলেন ডাঃ রায়। তখনই ঝিনুকের চোখ আটকায় একটা ফোটোফ্রেমে। টেবিলের পাশে ওয়ালল্যাকের উপর রাখা আছে ফোটোটা। বছর সাত-আটের ফুটফুটে ছেলে। কী মিষ্টি হাসি! শুধু

boierpathshala.blogspot.com

ক্লোজ-আপ। চোখ সরানো মুশকিল ফোটোটা থেকে। ঝিনুক জিজ্ঞেস করেই ফ্যালে, "ফোটোটা কার?"

ফোন নম্বর খুঁজতে-খুঁজতে ডাক্তারবাবু বলেন, "আমার ছেলের।"

ডাঃ রায়ের বয়সের সঙ্গে ছেলের বয়স মানাচ্ছে না। ঝিনুক তাই বলে, "নিশ্চয়ই ছেলেবেলার ফোটো?"

"ওর বেলা আর বাড়েনি। ওই বয়সেই মারা গিয়েছে।"

ডাঃ রায়ের কথায় ভীষণ ধাক্কা লাগে ঝিনুকের। কষ্ট গুটলি পাকিয়ে উঠছে গলায়। দীপকাকুর দিকে চোখ যায়। উনিও চেয়ে আছেন ফোটোটার দিকে। নিষ্পলক।

ডাঃ রায় একটা ডায়েরিতে খুঁজে পেলেন বুথের নম্বরটা। ছোট প্যাডের পাতায় নম্বর লিখে দীপকাকুকে এগিয়ে দিলেন।

চোখ বুলিয়ে পকেটে রাখলেন দীপকাকু। বললেন, "আজ তা হলে আসি। অনেক অমূল্য সময় নষ্ট করলাম আপনার।"

"না না। সময় কিছু নষ্ট হয়নি। সকালের পেশেন্ট দেখা আমার হয়ে গিয়েছে। আবার সেই বিকেলে। এখন রাউন্ড দেব নার্সিং হোমে।"

দীপকাকু উঠে দাঁড়িয়েছেন। হঠাৎ যেন কী মনে পড়ে তাঁর। বলেন, "ডাক্তারবাবু, আর-একটা প্রশ্ন।"

"বলুন না।"

"আপনার নার্সিং হোম তো ভালই চলে। তবুও এজেন্সির জন্য আপনি ওই অসৎ উপায়টা নিয়েছিলেন কেন?"

ম্লান হাসেন ডাঃ রায়। বলেন, "ছেলে মারা যাওয়ার পর আমার স্ত্রী খুব একা হয়ে পড়েছিল। অ্যাডের কাজের প্রতি বরাবরই ন্যাক ছিল ওর। এজেন্সি খুলে দিলাম। কিন্তু কোনও কাজ পায় না। তখনই নানা উপায়ে ব্যবসাটাকে দাঁড় করানোর চেষ্টা করছিলাম। এখন অবশ্য সে চিন্তাটা আর নেই। বিজনেস মোটামুটি স্টেডি।"

"থ্যাঙ্ক ইউ ডাঃ রায়।" বলে হ্যান্ডশেক করলেন দীপকাকু। ডাক্তারবাবু বললেন, "ও কে, যখনই দরকার পড়বে, আসবেন। আই অ্যাম অলওয়েজ অ্যাট ইওর সার্ভিস।"

ঝিনুক ডাক্তারবাবুকে বিদায়-নমস্কার করার সময় আর-একবার ছেলেটার ফোটোর দিকে তাকায়, কী জীবন্ত! যেন বলছে, 'আবার এসো।'

মন খারাপটা থেকেই গেল ঝিনুকের। সার্দার্ন অ্যাভিনিউ-এ লোটাস এজেন্সিতে ঢোকার আগে দীপকাকু সেটা খেয়াল করে বলেছিলেন, "কী ব্যাপার, মুখটা এমন ব্যাজার কেন? তোমার দুঃসাহসিক চেষ্টাটা মাঠে মারা গেল বলে!"

"কোনটা?" ভ্রু কুঁচকে জানতে চেয়েছিল ঝিনুক।

"অপারেশন হ্যান্ডবিল। লোকটাকে ছেড়ে দেওয়ায় তুমি বোধ হয় খুশি হওনি?"

রাগ হয়ে গিয়েছিল ঝিনুকের। কোনও উত্তর দেয়নি। যত বড়ই গোয়েন্দা হোন, দীপকাকুর মধ্যে আবেগ-অনুভূতিগুলো একটু কম। ডাঃ রায়ের নির্বিকার ভাবটাও ভাল লাগেনি ঝিনুকের। এদিকে ঝিনুক কিছুতেই ভুলতে পারছে না ছেলেটার মুখ। এত অল্প বয়সে কী করে মারা গেল! ওর মা নিশ্চয়ই ওকে ভুলতে পারেননি।

লোটাস এজেন্সিতে গিয়ে কোনও লাভ হল না। মালিক দেখাই করতে চাইলেন না দীপকাকুর সঙ্গে। কার্ড ফেরত দিয়ে রিসেপশনিস্ট বলল, "আগামী এক সপ্তাহ আমাদের ডিরেক্টর খুব ব্যস্ত। তার পরে আপনি দেখা করুন। আগে অ্যাপয়েন্টমেন্ট নেবেন।"

ভদ্রভাবে অপমান করা হল এটা। গোমড়ামুখে বেরিয়ে এসেছিলেন দীপকাকু। পরের গন্তব্য আর্টলাইন এজেন্সি। তিনি আবার কেমন ব্যবহার করেন কে জানে!

ঝিনুকরা এখন যাচ্ছে বিডন রো ধরে কলেজ স্ট্রিটে। ওখানেই আর্টলাইনের অফিস। কলকাতার এদিকটা ঝিনুকের প্রায় আসাই হয় না। অথচ ওর দু'ই প্রিয় কলেজবন্ধু থাকে এখানে। মোটরবাইকের পিছনে বসে ফুটপাতে, বসতবাড়িতে চোখ বোলাচ্ছিল ঝিনুক, যদি ওদের হঠাৎ দেখা যায়। জানে, অবাস্তব আকাঙ্ক্ষা। তবুও...। একটা ব্যাপার খেয়াল হতে ঝিনুক হেসে ফ্যালে, বাই এনি চান্স দেখা হয়েও যায় বন্ধুদের সঙ্গে, ঝিনুককে চিনতে পারবে না। মাথায় হেলমেট, চোখে কালো চশমা। যেন টিভি সিরিয়ালের ক্যারেক্টার। অবশ্যই রহস্য গল্পের।

দেড়শো নাকি দু'শো বছরের পুরনো বাড়িতে আর্টলাইনের অফিস। চওড়া সিঁড়ি বেয়ে উঠতে থাকে ঝিনুকেরা। এই বাড়িতে যে পঞ্চাশটারও বেশি অফিস আছে, প্রমাণ মিলেছে সিঁড়িতে ওঠার মুখে লেটার বক্সগুলো দেখে। দেওয়ালেও সেইসব কোম্পানির বোর্ড লাগানো। বোঝাই যাচ্ছে, আর্টলাইন তেমন বড়সড় এজেন্সি নয়।

পুরো সেকেন্ড ফ্লোরটা আর্টলাইনের। ভিতরে ঢুকে ভালই লাগে ঝিনুকের। ইতিহাসের দিদিমণি টাইপের চেহারা রিসেপশনিস্টের। দরজা, জানলা, আসবাবপত্তর ইংরেজ আমলের এবং সব কিছুই নিট অ্যান্ড ক্লিন। সিলিং থেকে নেমে আসা লম্বা রডের হলুদ ফ্যানটাও চকচক করছে।

দীপকাকুর কার্ড নিয়ে ভিতরে গিয়েছিলেন রিসেপশনিস্ট। ফিরে এসে বললেন, "আপনারা যান। উনি অপেক্ষা করছেন।"

চেম্বারে ঢুকতেই চেয়ার ছেড়ে উঠে সম্ভাষণ জানালেন আর্টলাইনের মালিক রাজদীপ সরকার। ইয়ং এজ। পৈতৃক ব্যবসা সামলাচ্ছেন মনে হয়। দীপকাকুকে বললেন, "বলুন, আপনাদের কোন কাজে লাগতে পারি আমি?"

মানুষটাকে বেশ খোলামেলা মনে হচ্ছে ঝিনুকের। চেম্বারটাতেও তাঁর মনের প্রতিফলন রয়েছে। ওঁর চেয়ারের পিছনে খোলা বিশাল জানলা। রোদ তেমন উজ্জ্বল নয়, দেখা যাচ্ছে পুরনো কলকাতার বাড়ি-ঘর। আকাশটাকেও মনে হচ্ছে পুরনো দিনের।

এখানে আসার কারণটা গুছিয়ে বললেন দীপকাকু। এ কথাও বলতে ভুললেন না, "ক'দিন আগে অ্যারোর গৌতম মজুমদারের সঙ্গে আপনার এবং লোটাসের মালিকের মিটিং হয়েছে। নিজেদের মধ্যে একটা অ্যাডজাস্টমেন্টে এসেছেন আপনারা। তবু আমাকে আসতে হল বিশেষ একটা প্রয়োজনে।"

"বলুন, প্লিজ।" রাজদীপ সরকারের মুখে আন্তরিক আগ্রহ।

দীপকাকু বলেন, "আমি শুধু জানতে চাই, অ্যারোর অ্যাড কপি আপনি কীভাবে সংগ্রহ করেছিলেন?"

"বিজনেস সিক্রেট আপনাকে কেন বলব?"

ভদ্রলোককে হঠাৎ বেঁকে যেতে দেখে অবাক হয় ঝিনুক। দীপকাকুও সঙ্গে-সঙ্গে ট্যারা হয়ে গেলেন, "বললে ভাল করতেন। একটু দেরি হলেও, বের আমি করবই, কে সাপ্লাই দিচ্ছে প্ল্যান। তখন কিন্তু আপনিও আইনি ঝামেলায় জড়িয়ে যাবেন।"

মিটিমিটি হাসছেন রাজদীপ। বললেন, "আমি আপনাকে টেস্ট করছিলাম। দেখছিলাম, হেল্প করতে না চাইলে, কেমনভাবে রি-অ্যাক্ট করেন আপনি। আসলে আমি কোনওদিনই বাস্তবের গোয়েন্দা দেখিনি। যা পড়েছি গল্প-উপন্যাসে।"

রাজদীপ এবার দৃষ্টি ঘোরালেন ঝিনুকের দিকে। উৎসাহী কণ্ঠে বললেন, "লেডি অ্যাসিস্ট্যান্ট দেখাটা আমার উপরি পাওনা। রেয়ার ব্যাপার। আপনার এই তদন্তের ইন ডিটেল নিশ্চয়ই উনি লিখে রাখছেন।"

"হ্যাঁ। সামনের কোনও একটা পুজোসংখ্যায় গল্পটা পাবেন।" গম্ভীরভাবে বললেন দীপকাকু।

রাজদীপ হো হো করে হেসে উঠলেন। ভাগ্যিস ধরতে পেরেছেন ঠাট্টাটা। এতক্ষণ এমনভাবে ঝিনুক, দীপকাকুকে দেখছিলেন, যেন চিড়িয়াখানার খাঁচার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন।

"প্লিজ, কাম টু দ্য পয়েন্ট। কে সাপ্লাই দিচ্ছে অ্যারোর আইডিয়া?" সিরিয়াস কণ্ঠে জানতে চাইলেন দীপকাকু।

নিজেকে ধাতস্থ করে রাজদীপ বলেন, "আইডিয়া পেয়েছি ফোনে।"

"ফোনে তো আপনাকে কপি কালেক্ট করতে বলা হয়। কোথায় যেতে হয়েছিল, কত টাকা দিতে হয়েছে?"

boierpathshala.blogspot.com

দীপকাকুর প্রশ্নটা ঠিক যেন বুঝতে পারছেন না রাজদীপ। কপালে ভাঁজ ফেলে বলেন, "কপি বা ডিজাইন কিছুই দেয়নি। যা বলার ফোনেই বলেছিল। টাকা-পয়সাও কিছু চায়নি।"

"ট্রেঞ্জ!" বলে ওঠেন দীপকাকু। ঝিনুকও ভীষণ অবাক হয়েছে, ডাঃ রায় বলেছেন, টাকা দিয়ে লে-আউট কিনেছেন। রাজদীপ বলছেন, পয়সা লাগেনি। কেউ একজন মিথ্যে বলছেন। দীপকাকুর অবাক হওয়ার আসল কারণটা ধরতে পারলেন না রাজদীপ। বললেন, "আমিও খুব আশ্চর্য হয়েছিলাম জানেন। কোনও বিনিময় ছাড়া কেন কেউ এ-কাজটা করবে? পরে লোটাসের ডিরেক্টর রানার সঙ্গে কথা বলে জানলাম, ওর ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে।"

"রানাবাবু কি আপনার বন্ধু?" রাজদীপের কথার সুরে আন্দাজ করলেন দীপকাকু।

"হ্যাঁ। কলেজবেলা থেকে।"

"উনি কিন্তু আমাদের এড়িয়ে গিয়েছেন।"

"জানি। খানিক আগে ফোন করে বলেছে। ওর বক্তব্য, আমাদের সঙ্গে যখন অ্যারোর কথা হয়েছে, ফারদার ফোনে এরকম কোনও ইনফরমেশন এলে ওদের জানাব। তা হলে আবার কেন ডিটেকটিভ।"

তখনই কোনও উত্তর দিলেন না দীপকাকু। ভাবতে সময় নিলেন। একটু পরে বললেন, "আপনারা ছাড়াও তো দু'টো এজেন্সি অ্যারোর প্ল্যান পেয়েছে। তালিকাটা বাড়তেও পারে। তাই আপনাদের সাহায্য নিয়ে সোর্সটাকে যদি এখনই না আইডেনটিফাই..."

কথা কেড়ে রাজদীপ বলেন, "আচ্ছা মশাই, আপনি কি এখনও বুঝতে পারছেন না, সোর্স লুকিয়ে আছে ওই তিন পার্টনারের মধ্যেই। নিজেদের ভিতর কোনও ঝগড়াঝাটি হয়েছে, শোধ নিতে বিশ্বাসভঙ্গ করছে একজন।"

"ফোনের গলা আপনি কি চিনতে পেরেছিলেন?"

"না। অন্য কাউকে দিয়ে ফোনটা করাতে পারে।"

"ফাইন! নম্বরটা আছে আপনার কাছে?"

"আছে।" বলে মোবাইলের বোতাম টিপতে লাগলেন রাজদীপ। এক সময় থেমে নম্বরটা বললেন।

চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লেন দীপকাকু। নমস্কারের ভঙ্গি করে বললেন, "আজ তা হলে উঠি। কো-অপারেট করার জন্য ধন্যবাদ।"

"সে কী মশাই, নম্বরটা তো আপনি লিখলেন না! মনে থাকবে এত বড় নম্বর?"

মুচকি হেসে দীপকাকু বললেন, "থাকবে।"

রাজদীপ সরকারের বিস্মিত দৃষ্টি পিছনে ফেলে বেরিয়ে এল ঝিনুকরা। ঝিনুক কিন্তু মোটেই অবাক হয়নি। তার কারণ এই নয় যে, দীপকাকুর স্মৃতি খুব প্রখর। অন্য একটা সূত্র আছে।

অফিস-বাড়ির আলো-অন্ধকার সিঁড়ি দিয়ে নামতে-নামতে ঝিনুক দীপকাকুকে বলে, "ডাঃ রায়ের কাছে এই নম্বর থেকেই ফোন গিয়েছিল না?"

"গুড! মাথা তো ভালই কাজ করছে তোমার।"

উৎসাহ পেয়ে ঝিনুক বলে, "কী করে ধরলাম বলুন তো? আমি ডাঃ রায়ের দেওয়া নম্বরটা কিন্তু দেখিইনি।"

"শুনেছিলে বুথের নম্বর। এটাও যেহেতু ফোন বুথের এবং দেখলে আমি নোট করলাম না। দুইয়ে-দুইয়ে চার করে নিলে।"

নিভে গেল ঝিনুকের উৎসাহ, দীপকাকুকে অবাক করে দেওয়া বড় কঠিন কাজ।

রাস্তায় ঝাঁ ঝাঁ করছে রোদ। ঘড়ি দ্যাখে ঝিনুক, প্রায় দেড়টা বাজে। খিদে-খিদে পাচ্ছে। মোটরবাইক রাখা ছিল অফিস বিল্ডিং ঘেঁষে। দীপকাকু স্ট্যান্ড থেকে নামাচ্ছেন গাড়িটা। খাওয়ার কথাটা একটু ঘুরিয়ে তুলতে যায় ঝিনুক, "এবার আমরা নিশ্চয়ই যোধপুর পার্কের সেলুনে যাব?"

সিটে উঠতে গিয়ে থমকে যান দীপকাকু। জিজ্ঞেস করেন, "সেলুনে কেন যাব?"

"গৌতমবাবু ফোন রেখে যেখানে ঘুমিয়ে..."

কথার মাঝপথে হাসছেন দীপকাকু। বাইকে উঠে বসে হেলমেট পরতে-পরতে বললেন, "ওটা ওঁকে ঘাবড়ে দেওয়ার জন্য বলেছিলাম। উনি ঘুমিয়ে পড়লেও, সেলুনের বাকি লোক তো জেগেছিল। ওঁর সামনে থেকে সেলফোন নিয়ে একজন বসে-বসে মেসেজ পাঠাবে, কেউ লক্ষ করবে না, তা হয় নাকি?"

সত্যি তো, এদিকটা তার ভেবে দেখা উচিত ছিল, নিজের মাথাতেই ছোট্ট করে একটা চাঁটি মারতে ইচ্ছে করছে ঝিনুকের। দীপকাকু নিজে থেকেই বলেন, "আমরা এখন যাব গড়িয়ার সেই ফোন বুথে, যেখান থেকে ফোন করে আইডিয়া পাচার হয়েছে। তার আগে অবশ্য লাঞ্চ সেরে নেব ধর্মতলায়। তোমার খিদে পেয়েছে বোধ হয়। শুকনো লাগছে মুখটা।"

নাঃ, লোকটাকে যতটা নীরস দেখতে লাগে, ততটা নয়, ফিলিংটিলিংগুলো আছে। লাজুক হাসি হেলমেটে ঢেকে ঝিনুক বাইকের পিছনে উঠে বসে।

॥ ৫ ॥

পরের দিন ঘুম ভাঙতে বেলা হল ঝিনুকের। ঠিক কতক্ষণ আগে কে জানে, একটা ফোন এসেছিল ড্রয়িং রুমে, তার পরই বাবা এসেছিলেন ঝিনুকের ঘরে। জিজ্ঞেস করেছিলেন, "ঝিনুক, তোদের আজ কী প্রোগ্রাম রে? দীপঙ্কর সকালে আসবে?"

"জানি না।" বলে পাশ ফিরেছিল ঝিনুক। ঘুম তখনও কমপ্লিট হয়নি। এখন পুরোপুরি জেগে ওঠার পর খটকা লাগছে, বাইরের ঘরে ফোন আসার পরই বাবা কেন দীপকাকুর খোঁজ করলেন? ব্যাপারটা জানতে হচ্ছে।

বিছানায় উঠে বসল ঝিনুক। বালিশের দিকে ঘাড় ফেরাল, ডায়েরি, নোটবুক, পেন, কোনওটাই নেই। মা নিশ্চয়ই গুছিয়ে তুলে রেখেছেন টেবিলে। কাল অনেক রাত অবধি জেগে ঝিনুক কেসের অনুপুঙ্খ লিখেছে ডায়েরিতে। এটা সে করে থাকে দীপকাকুর নির্দেশে। কাকু বলেন, 'তদন্তের পর্যায়ক্রম এবং তার থেকে ওঠা প্রশ্নগুলোয় খোঁজ করলে, সমাধানের একটা আবছা আভাস পাওয়া যায়।' ঝিনুক কিছুই পায়নি। বরং গোটা ব্যাপারটা লেখার পর সব কেমন গুলিয়ে যাচ্ছে! গুরুতর প্রশ্ন হয়ে দেখা দিচ্ছে একটা পয়েন্ট, অপরাধী কনসেপ্ট পাচার করল একজনের কাছে পয়সা নিয়ে, আর দু'জনের কাছে নিল না! রূপরেখার সঙ্গে কেমন ডিল হয়েছে জানা যায়নি। তিনি তো হাঁকিয়ে দিলেন ঝিনুকদের।

রেস্তরাঁয় হুমকির চিরকুট দেওয়া লোকটা আর হ্যান্ডবিলওলা একই ব্যক্তি কিনা, জানা যাবে দু'দিন পর। কাল গড়িয়ার ফোন বুথ থেকে ফেরার পথে দীপকাকু ফরেনসিক ল্যাবে দিয়ে এসেছেন লিফলেটটা। ধুলো লাগা হাতের ছাপ আছে ওতে।

ফোন বুথে তেমন কোনও কাজ হয়নি। বুথ অ্যাটেনডেন্টকে গুরুত্বপূর্ণ কোনও প্রশ্নও করেননি দীপকাকু। টুকটাক গল্পগাছা করে, লোকেশনটা ভাল করে বুঝে নিলেন। বুথে একটাই ফোনসেট। খুব একটা ভিড়ভিড় হয় না। এলাকাটা একটু নিরালা টাইপের।

এই তদন্তের সূত্রে এখন পর্যন্ত যাদের সঙ্গে দেখা হয়েছে ঝিনুকদের, সবাই কেমন যেন একটু ধোঁয়াটে টাইপের। তুলনামূলকভাবে ডাক্তারবাবু মানুষটি ভাল। তবে তাঁকেও পুরোপুরি নিরপরাধ বলা যায় না। অসৎ পথে উনিও কনসেপ্ট সংগ্রহ করেছিলেন।

কাল ধর্মতলার রেস্তরাঁয় লাঞ্চ করতে বসে দীপকাকু একটা ইমপর্ট্যান্ট কমেন্ট করেন, "প্রথমে আইডিয়া চুরি যাওয়া দেখে আমার মনে হয়েছিল, স্রেফ প্রফেশনাল জেলাসি থেকে কোনও এজেন্সি এটা করছে। কিন্তু পেমেন্ট সংক্রান্ত ফোনের যে ঘটনা ঘটল, বোঝাই যাচ্ছে, অ্যারো কোম্পানিকে তুলে দেওয়াই অপরাধীর লক্ষ্য। আমাকে এখন বের করতে হবে, অপরাধী কেন এ কাজ করছে? শত্রুতার মূল কারণটা কী?"

boierpathshala.blogspot.com

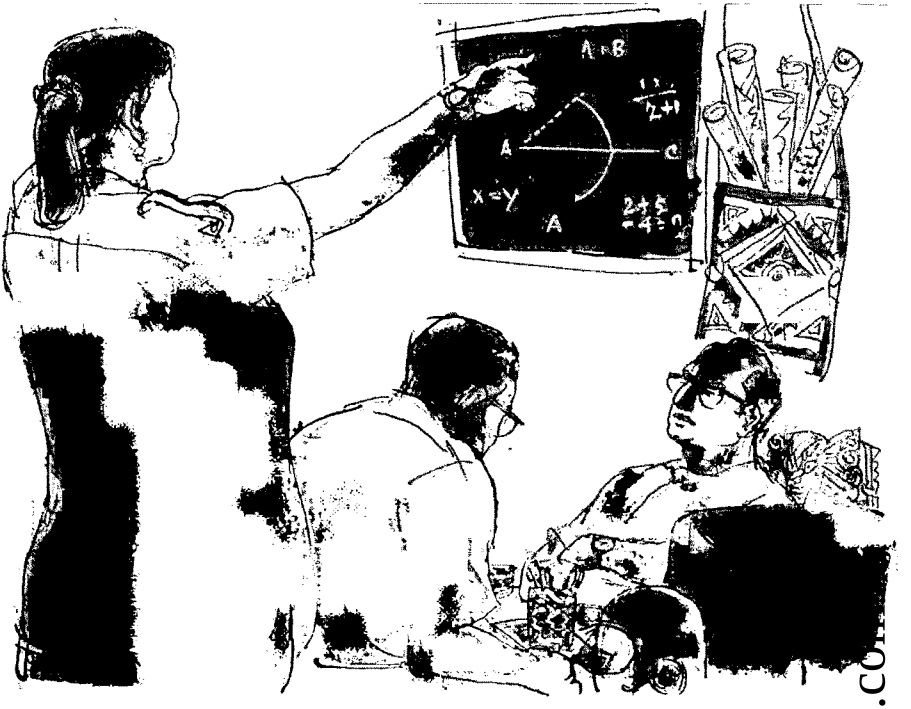

ঘুম থেকে ওঠার পর মাথা কোথায় ফ্রেশ থাকবে, ফের ভারী হয়ে যাচ্ছে। ঝিনুক নেমে আসে বিছানা থেকে।

ঘর থেকে বেরোতেই মায়ের মুখোমুখি পড়ে যায়। মা বলেন, "মহারানির ঘুম ভাঙল তা হলে! আজও কলেজ কামাই নাকি?"

আড়মোড়া ভেঙে ঝিনুক বলে, "না। আজ যাব।"

"আমার সৌভাগ্য!" বলে মা এগিয়ে যান নিজের কাজে। বহুক্ষণ আগেই দিন শুরু হয়ে গিয়েছে মায়ের। ঝিনুকের এখন ফার্স্ট ইয়ার। একটা-দু'টো দিন কলেজ অফ করলে কিছু এসে যায় না।

বাইরের ঘরে বাবা এখন কাগজ পড়ছেন। সেন্টার টেবিলে ধূমায়িত চা মা নিশ্চয়ই দিয়ে গেলেন এখন। বাবার উলটো দিকের সোফায় এসে বসে ঝিনুক। বাংলা পেপারটা দেখছেন বাবা, ইংরেজিটা টেবিলে, তুলে নিয়ে ঝিনুক জানতে চায়, "কার ফোন এসেছিল সকালে?"

কাগজের আড়াল থেকে বাবা বলেন, "তোমার নয়।"

'তুমি' করে কথা বলছেন বাবা। রেগে আছেন। খানিক চুপ করে থেকে ঝিনুক ফের বলে, "দীপকাকুর খোঁজ করছিলে কেন তখন?"

"দরকার আছে।" আবার সংক্ষিপ্ত উত্তর। ঝিনুক বুঝে উঠতে পারছে না, কী নিয়ে বাবা এতটা সিরিয়াস হয়ে গিয়েছেন। চরিত্রে দিলখোলা মানুষ। কদাচিৎ রাগতে দেখা যায়। রাগটা তার উপর, নাকি দীপকাকুর উপর, বোঝা যাচ্ছে না।

গলা খাদে রেখে ঝিনুক বলে, "দীপকাকুকে ফোন করে দেখব একবার?"

"করেছিলাম বাড়িতে। মনে হয় বেরিয়ে গিয়েছে। মোবাইল অফ।"

এত সকালে কোথায় বেরোলেন দীপকাকু! কাল তো বলেছিলেন, বাড়িতে বসে আজ শুধু ভাববেন। অফিসেও যাবেন না। দীপকাকুর ডিটেকটিভ এজেন্সির দরজা খোলা রাখবে একমাত্র স্টাফ সুদর্শনকাকু। খুব দরকার ছাড়া ঝিনুককেও ফোন করতে বারণ করে দিয়েছেন। এমনও হতে পারে, আকস্মিকভাবে জোরালো কোনও ক্লু পেয়ে বেরিয়ে পড়েছেন তদন্তে। গোয়েন্দার তো রুটিন বলে কিছু হয় না।

নিউজপেপারের উপর দিয়ে বাবাকে লক্ষ করে ঝিনুক। না, মেজাজ বদলের কোনও আভাস নেই। একই রকম থমথম করছে মুখ। এবার একটু দুশ্চিন্তা হচ্ছে ঝিনুকের। কী যে ঘটল! এখনই কোনও উত্তর আশা করা বৃথা, সময়মতো বাবা নিজেই বলবেন। পেপারটা ভাঁজ করে টেবিলে রাখে ঝিনুক, উঠে দাঁড়ায়।

মুখ থেকে কাগজ নামিয়ে বাবা বলেন, "কোথায় যাচ্ছিস?"

"কলেজে যাব। তৈরি হতে হবে।"

"আজ তোদের ইনভেস্টিগেশন নেই?"

"জানি না। দীপকাকু কিছু বলেননি।"

বাবার পরের কথাটা খুবই অপ্রত্যাশিত, "ঠিক আছে, তাড়াতাড়ি রেডি হয়ে নে। আমার সঙ্গে প্রথমে দীপঙ্করের বাড়ি যাবি। তারপর কলেজ।"

"হঠাৎ দীপকাকুর বাড়ি কেন?" ভীষণ অবাক হয়ে জানতে চায়

boierpathshala.blogspot.com

ঝিনুক।

সোফা ছেড়ে উঠতে-উঠতে বাবা বলেন, "ওখানে গিয়ে জানতে পারবি।"

হেঁয়ালি বা সাসপেন্স বাবা বেশিক্ষণ ধরে রাখতে পারেন না। আজ কিন্তু পারছেন। বাঁশদ্রোণী ব্রিজ পার হয়ে গেল ঝিনুকদের গাড়ি, বাবা কিন্তু এখনও বলেননি, কেন যাচ্ছেন দীপকাকুর বাড়ি। ঝিনুকও আর জিজ্ঞেস করেনি কারণটা। বোঝাই যাচ্ছে, যা বলার দীপকাকুর সামনেই বলবেন।

গাড়ি ড্রাইভ করছে আশুদা। ক'দিন আগে মাকে বলেছে, 'বাড়িতে গাড়ি থাকতে খোলামেলা মোটরবাইক চেপে ঝিনুকদিদি চোর-গুন্ডা ধরতে যাচ্ছে, এটা কি ঠিক হচ্ছে?' অর্থাৎ আশুদাকে এবারের অভিযানে নেওয়া হয়নি, তাই আক্ষেপ। অথচ দীপকাকুকে তেমন পছন্দ করত না আশুদা, বড্ড ঘুরপাক খাওয়ান। আজ দীপকাকুর বাড়ি যাওয়া হচ্ছে শুনে, বেশ চনমনে হয়ে উঠল। রহস্যের নেশা আশুদাকেও পেয়ে বসেছে।

পিরপুকুরে দীপকাকুর ভাড়াবাড়ির সামনে এসে পড়েছে ঝিনুকরা। দীপকাকু থাকেন দোতলায়। মূল বাড়ির গা বেয়ে মাটি থেকে সিঁড়ি উঠে গিয়েছে উপরে।

ঝিনুক এ-বাড়িতে বারতিনেক এসেছে। সব সময়ের কাজের বৃদ্ধা আর দীপকাকুর সংসার। দীপকাকুর বাবা-মা, ভাই-বোন থাকেন মেদিনীপুরে আদিবাড়িতে।

ঝিনুক আর বাবা সিঁড়ি বেয়ে এখন বন্ধ দরজার সামনে। ডোরবেল টেপেন বাবা। একটু পরে দরজা খুলে যায়। কাজের মাসি সামনে। বাবা বলেন, "দীপঙ্কর আছে?"

"কখন উঠে পড়েছে। আসুন।"

কাজের মাসি কানে কম শোনে। বেশির ভাগ উত্তর আন্দাজে দেয়। এখন যেমন দিল।

ঘরে পা দিয়ে ঝিনুক দেখল, আগের মতোই ওলটপালট অবস্থা। কলকাতায় যদি এলোমেলো ঘরের জন্য কোনও কম্পিটিশন হয়, নিদেন পক্ষে এ-ঘরটা সেকেন্ড হবে। তবে দীপকাকুকে এই মুহূর্তে খুব পরিচ্ছন্ন লাগে, প্যান্ট-শার্ট পরে চুল আঁচড়াচ্ছিলেন আয়নায়। ঝিনুকদের দেখে অবাক হন, "আপনারা হঠাৎ?"

"তুমি কি কোথাও বেরোচ্ছিলে?" জানতে চান বাবা।

"হ্যাঁ, সে নয় একটু পরে বেরনো যাবে। আপনি বসুন।"

বসার জায়গা বলতে দু'টো। দীপকাকুর স্টাডির চেয়ার আর কাত হওয়া বেতের সিঙ্গল সোফা। অতি সন্তর্পণে বাবা বসলেন সোফায়, ঝিনুক চেয়ারে। বাবা বললেন, "সকাল থেকে ফোনে পাচ্ছি না, তাই চলে এলাম।"

"আর বলবেন না! অ্যারোর কেসটা এত ভোগাচ্ছে, দু'টো ফোনই অফ রেখে টানা ভেবেছি। একটু আগে সেট দু'টো অন করতেই অফিস থেকে ফোন। সুদর্শন বলছে, কাল নাকি বেশ ক'টা পার্টি ফিরে গিয়েছে। ভাবলাম, যাই, ঘুরেই আসি অফিস থেকে।" একটু থেমে দীপকাকু বলেন, "বলুন রজতদা, আপনার হঠাৎ আগমনের কারণ?"

বাবা বলেন, "দাঁড়িয়ে সব কথা হয় নাকি! কোথাও একটা বসো তুমি।"

অপ্রতিভ হন দীপকাকু। বলেন, "হ্যাঁ, এই তো, আনছি।"

দূরে সিঙ্গল খাটের কাছে হেঁটে গেলেন দীপকাকু, নিচ থেকে বের করছেন আদ্যিকালের মোড়া। এরই মধ্যে ঝিনুক চোখ বুলিয়েছে দীপকাকুর হোমওয়ার্কে, বিশাল টেবিলের একপাশে কম্পিউটার। পিছনে ব্ল্যাকবোর্ড, চকে আঁকা পরপর তিনটে রাউন্ড, নীচে পর্যায়ক্রমে লেখা এস পি জি। একটু তফাতে আর-একটা রাউন্ড। তার তলায় লেখা এক্স। বাকি বোর্ড জুড়ে নানান সংখ্যা। মনে হচ্ছে কোনও জটিল অঙ্ক করা হয়েছে। টেবিলে খোলা আছে বিভিন্ন বিষয়ের বই, চার খণ্ড এনসাইক্লোপিডিয়া, মনোবিজ্ঞান, সাধারণ জ্ঞান, বিজ্ঞাপন সংক্রান্ত বই...বোঝাই যাচ্ছে নাজেহাল অবস্থা।

বাবার সামনে মোড়া নিয়ে এসে বসলেন দীপকাকু, "এবার বলুন।"

শুরু করলেন বাবা, "আজ সকালে বাড়িতে একটা ফোন আসে। আমাকেই করা হয়েছিল ফোনটা। বলল, 'আপনার স্নেহভাজনকে বলুন অ্যারোর কেস ছেড়ে দিতে। পঞ্চাশ হাজার দেব। যদি না ছাড়ে, ক্ষতি হয়ে যাবে আপনার মেয়ের। ওকে তো রাস্তাঘাটে একলা বেরোতে হয়।' আমি 'কে বলছেন, কে বলছেন' বলতেই, কেটে দিল ফোনটা।"

দীপকাকুর ভারী চশমা নেমে এসেছে নাকের ডগায়, চোখ দু'টো বিস্ময়ে বড়-বড়। ঝিনুকেরও রাগে কান গরম হয়ে যাচ্ছে, এত বড় সাহস! এরকম হুমকি! এই জন্যেই বাবা সকাল থেকে মুড খারাপ করে বসেছিলেন।

নাক থেকে চশমা ঠেলে তুলে দীপকাকু বলেন, "ফোনে যে কণ্ঠস্বর আপনি শুনেছেন, নকল বলে মনে হল? গলা পালটানোর চেষ্টা একটু খেয়াল করলেই কিন্তু ধরা যায়।"

বাবা মাথা নাড়েন। বলেন, "না, সেরকম কিছু তো মনে হয়নি। বেশ খোলা গলায় কথা বলছিল লোকটা। তবে উচ্চারণ অত্যন্ত মার্জিত, হুমকির সুর ভিলেনদের মতোই।"

'ভিলেন' কথাটায় ঝিনুকের মন হাল্‌কা হয়ে গেল। বাবা হিন্দি সিনেমার কোনও ভিলেনকে কল্পনা করছেন?

দীপকাকু একই রকম সিরিয়াস। খানিক ভেবে নিয়ে বলেন, "এখন পর্যন্ত যা সূত্র পাওয়া গিয়েছে, তিন পার্টনারের মধ্যেই লুকিয়ে আছে অপরাধী। কিন্তু তাদের কারও মুখেই এরকম হুমকির সুর মানায় না। এই কেসের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, সম্ভাব্য অপরাধীর আচরণের সঙ্গে অপরাধের কোনও মিল নেই।"

কথা শেষ হতেই ঝিনুক আঙুল তোলে ব্ল্যাকবোর্ডে। বলে, "সেই জন্যই আপনি এক্স ধরে আর-একজনের অস্তিত্ব অনুমান করছেন।"

ঝিনুকের দিকে তাকিয়ে ম্লান হাসেন দীপকাকু। ওই হাসির মধ্যেও 'বাহবাটুকু' পড়া যায়। উৎসাহিত ঝিনুক আরও বলে, "এস পি জি তিনটে রাউন্ড হচ্ছে, সুজয়, পার্থ, গৌতম। কি, ঠিক বলেছি কিনা?"

সপ্রশংস দৃষ্টিতে বাবা ঝিনুকের দিকে তাকিয়ে আছেন, দীপকাকুর কোনও হেলদোল নেই। মিয়নো গলায় বলেন, "এেন যথেষ্ট ম্যাচিওর হয়েছে তোমার। কিন্তু এই কেসটায় আর তোমায় সঙ্গে নেওয়া যাবে না। রিস্ক হয়ে যাবে।"

"না, ঝিনুক থাকবে তোমার সঙ্গে। তবে এবার থেকে তোমরা আমার গাড়িটা ব্যবহার কোরো।"

মনে-মনে বাবাকে স্যালুট দেয় ঝিনুক, এক্স-মিলিটারিম্যানের মিলিটারি সুর আজও অটুট।

চা, বিস্কুট নিয়ে এসেছে বৃদ্ধা মাসি। খেতে-খেতে কথা চলতে থাকে। দীপকাকু বলেন, "আপনাদের ল্যান্ডফোনে সি এল আই লাগানো থাকলে কোথা থেকে ফোনটা করা হয়েছিল বোঝা যেত।"

বাবা উত্তর দেন, "তুমিই লাগিয়ে দিও খরচ করে। তোমার কেসের জন্যই যখন ফোনগুলো আসছে।"

রসিকতাটা ছুঁল না দীপকাকুকে। চায়ের কাপ-ডিশ মেঝেয় নামিয়ে কপাল কুঁচকে বলতে শুরু করলেন, "আপনাকে ফোনে যে কথাগুলো বলা হয়েছে, তার মধ্যে বেশ কয়েকটা ক্লু লুকিয়ে আছে।"

"যেমন?" জানতে চাইলেন বাবা।

"নম্বর ওয়ান, আগে যে চিরকুট দু'টো আমরা পেয়েছি, তাতে বহুবচনের ব্যবহার ছিল। কয়েকজন মিলে যেন চিঠিটা দিচ্ছে। ফোনের কথা শুনে মনে হচ্ছে, হুমকি দিচ্ছে একজন। নম্বর টু, ফোন এবং চিঠি এসেছে একই জায়গা থেকে, চিরকুটে লেখা ছিল, ওরা যা দিচ্ছে তার ডবল দেব আমরা। ফোনে অ্যামাউন্টটা বলেই দেওয়া হচ্ছে। এখানে আর-একবার প্রমাণিত হল, তিন পার্টনারের মধ্যে আছেন কালপ্রিট, টাকার অ্যামাউন্ট ওঁরা তিনজন শুধু জানতেন।" দম নিতে থামলেন দীপকাকু।

এই পাড়াটা বেশ নিঝঝ। গাড়ি-ঘোড়ার আওয়াজ নেই। ঘরটা এমন পজিশনে, চড়া আলো ঢোকে না। এখানে বসে বেলা বোঝা দুষ্কর।

দীপকাকু ফের শুরু করলেন, "পয়েন্ট নম্বর থ্রি, লোকটি আপনার

boierpathshala.blogspot.com

বাড়ির ফোন নম্বর পেল কী করে? আমাদের বাদ দিয়ে আপনাকেই বা ফোন করল কেন?"

"কেন?" প্রশ্নটা ফিরিয়ে দেন বাবা।

"কারণ, লোকটিকে আমি, ঝিনুক হয়তো মিট করেছি। গলা শুনলেই চিনতে পারব।"

"আর নম্বরটা পেল কী করে?" এবার জিজ্ঞেস করে ঝিনুক।

দীপকাকু একটু চিন্তা করে নিয়ে বলেন, "আমাদের যেভাবে অনুসরণ করা হচ্ছে, নম্বর জানা কঠিন কাজ নয়। তবু এক্ষেত্রে আমরা সোর্স হিসেবে সুজয়বাবুকেই ধরে নেব। এই কেসে শুধু উনিই জানেন তোমাদের বাড়ির নম্বর।

চুপি চুপি ঢোক গেলে ঝিনুক, তদন্ত চলাকালীন নম্বরটা সে আর একজনকে দিয়েছে।

দীপকাকু বলে যাচ্ছেন, "পয়েন্ট নম্বর ফোর, সবচেয়ে বেশি ইমপর্ট্যান্ট 'স্নেহভাজন' কথাটা ভীষণ শোনা-শোনা লাগছে।"

কথা শেষ করে মিটিমিটি হাসছেন দীপকাকু। কিছুই বুঝতে না পেরে বাবা একবার ঝিনুকের, পরের বার দীপকাকুর দিকে তাকালেন। বিদ্যুৎ-চমকের মতো ঝিনুকের ততক্ষণে মনে পড়ে গিয়েছে সেই ডায়লগ, 'আপনার স্নেহভাজনের সঙ্গে কথা বলে আমার মনে হচ্ছে, উনিও আমাকে হেল্প করতে পারবেন।' ঝিনুক বলে ওঠে, "সুজয় ঘোষ। আমাদের বাড়িতে যেদিন এসেছিলেন, দীপকাকুর প্রসঙ্গে বলেছিলেন কথাটা।"

"রাইট ইউ সে। কথাটা উনি ধার করেছিলেন তোমার বাবার থেকে। রজতদা ওই সম্বোধনে সুজয়বাবুর সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দেন।"

"তা হলে কি সুজয় ঘোষই কালপ্রিট?" বিস্ময়ের সঙ্গে জানতে চান বাবা।

দীপকাকু ঝিনুকের দিকে তাকান। বলেন, "তোমার কী মনে হয়?"

ভাবতে সময় নেয় ঝিনুক। একটু পরে বলে, "সুজয়বাবু অপরাধী হলেও হতে পারেন। ফোনটা কিন্তু উনি করেননি। ধরা পড়ে যেতেন বাবার কাছে। গলা নকল করার কোনও চেষ্টা যখন ছিল না..."

"দুর্দান্ত! ঝিনুক, তুমি তো দেখছি আমার অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে ক্রমশ অপরিহার্য হয়ে উঠছ!"

দীপকাকুর উচ্ছ্বাসে তেমন উৎসাহিত হল না ঝিনুক। কাঁচুমাচু মুখ করে বলল, "সুজয়বাবু ছাড়া এই কেসের আর-একজন আমাদের বাড়ির ফোন নম্বর জানেন। আমিই তাঁকে দিয়েছি।"

কপালে ভাঁজ পড়ে দীপকাকুর। জানতে চান, "কাকে দিয়েছ?"

"অ্যারোর রিসেপশনিস্টকে।"

"কেন দিলে?"

"উনি বলছিলেন, আমি নাকি মডেলিংয়ের পক্ষে খুব সুটেবল। যোগাযোগের জন্য নম্বরটা রাখলেন।"

দীপকাকুর চোখে-মুখে হতাশা ফুটে ওঠে। বলেন, "বিরাট ভুল করেছ তুমি। আ গ্রেট মিসটেক। আমার কাজটা ফের ছড়িয়ে গেল। সুজয়বাবুকে কেন্দ্রে রেখে তদন্ত গুটিয়ে এনেছিলাম প্রায়। এখন তো মনে হচ্ছে, অফিসের কিছু স্টাফ ষড়যন্ত্রের অংশীদার।"

ঝিনুক মাথা নিচু করে আছে। তবে দোষ স্বীকার করে হাল্‌কাও লাগছে বেশ। দীপকাকুর কথা এখনও শেষ হয়নি। বলতে শুরু করলেন, "তোমার যে মডেলিংয়ে এত ঝোঁক, আগে বুঝিনি। আমার সঙ্গে ঘুরে খামোকা সময় নষ্ট করো কেন?"

ভুল ভাঙিয়ে দিতে মুখ তোলে ঝিনুক। তার আগে বাবা বলে ওঠেন, "কেন বেচারিকে বকাবকি শুরু করলে দীপঙ্কর? ইয়ং এজ, মডেলিংয়ের প্রতি আকর্ষণ থাকাই স্বাভাবিক!"

মহা ঝামেলায় পড়ল ঝিনুক, দুই অভিভাবকই তাকে ভুল বুঝতে শুরু করেছেন, একজন করছেন সমর্থন, অন্যজন ভর্ৎসনা।

ভাগ্যিস দীপকাকুর সেলফোন বেজে উঠল। এবার নিশ্চয়ই ঘুরে যাবে প্রসঙ্গ। ফোন কানে নিয়েছেন কাকু, কিন্তু এ কী, মুখটা ক্রমশ কঠিন হয়ে উঠছে কেন? কোনও গন্ডগোল নিশ্চয়ই। কে ফোন করল?

অনেকক্ষণ ও প্রান্তের কথা শুনে দীপকাকু বললেন, "না, পুলিশ ডাকার দরকার নেই। আমি এক্ষুনি আসছি।"

ফোন অফ হয়ে গেল। সেট পকেটে রাখলেন দীপকাকু। থমথম করছে মুখ। বাবা জিজ্ঞেস করলেন, "কার ফোন?"

"অ্যারোর গৌতমবাবু। ডিরেক্টরস চেম্বারে একটা লকার আছে। তার যাবতীয় জিনিস উধাও।"

"সে কী! কী কী ছিল লকারে?" উদ্বিগ্ন কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন বাবা।

মোড়া ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছেন দীপকাকু। চিন্তিত মুখে বললেন, "কতটা কী চুরি গিয়েছে ওখানে গিয়ে ডিটেল জানতে পারব। ফোনের কথা শুনে মনে হল, মূল্যবান কিছু খোয়া যায়নি। লকারটা ভাঙা হয়নি। খোলা হয়েছে। চুরির ধরনটা সেই একই রকম।"

"মানে?" জানতে চায় ঝিনুক।

দীপকাকু বলেন, "লকারটা নম্বর দিয়ে লক করা হয়। আগের ঘটনার মতোই নম্বরটা জানতেন শুধু তিন পার্টনার।"

"এ তো আর সহ্য হয় না দীপঙ্কর!" তেড়েফুঁড়ে সোফা থেকে উঠলেন বাবা। ফের বললেন, "বারবার একই রকমভাবে বোকা বানাবে, আমরা কিছুই করতে পারব না! আজ আমি যাব তোমাদের সঙ্গে। লকারের কেস যখন, কিছুটা আমার কাজের এক্তিয়ারে পড়ে।"

বাবা সিকিউরিটি এজেন্সি চালান, বলতেই পারেন কথাটা। ঝিনুক ভীষণ এক্সাইটেড, এই প্রথম তাদের অভিযানে সঙ্গী হচ্ছেন বাবা।

গাড়ির পিছনের সিটে বাবা আর ঝিনুকের মাঝে গুম মেরে বসে আছেন দীপকাকু। বাবা বেশিক্ষণ সিরিয়াস থাকতে পারেন না। দীপকাকুর উদ্দেশে বলেন, "এত চিন্তা করার কী আছে! ঘটনাস্থলে যাই, দেখি সবকিছু। তারপর না হয় ভাবা যাবে। মনের উপর বেশি লোড নেওয়া ভাল নয়।"

দীপকাকুর দিক থেকে কোনও সাড়া নেই। হাজরা মোড় পেরোল ঝিনুকরা। অফিস টাইম। ভিড়, ট্রাফিকে জমজমাট ফুটপাত, রাস্তা। এরপরই শুরু হবে স্কুল, কলেজের ভিড়। সবাই রোজকার কাজে ব্যস্ত। ঝিনুক চলেছে স্রোতের বিপরীতে। থ্রিলিং লাইফ। মা বলেন, "তোর পড়াশোনা লাটে উঠল বলে!"

ঝিনুক বোধ করে উলটোটা, একটা সফল অভিযানের পরেই, পড়াশোনায় আরও মন বসাতে পারে ঝিনুক।

"আমাকে বলো তো, কী ভাবছ এত। দেখি, কোনও হেল্প করতে পারি কি না।" বাবার গলায় ধৈর্যের ঘাটতি।

"অঙ্ক।" এইটুকু বলে থেমে যান দীপকাকু।

"অঙ্ক ভাবছ! সে তো কষার জিনিস!" বলেন বাবা।

অন্যমনস্ক গলায় দীপকাকু বলতে থাকেন, "এই কেসটার সবচেয়ে বড় মুশকিল হচ্ছে, সন্দেহভাজনরা প্রত্যেকই বেশ বুদ্ধিমান এবং সৃজনশীল কাজকর্মের সঙ্গে যুক্ত। এই তালিকায় আমি, যারা কনসেপ্ট হাতিয়েছে, তাদেরকেও রাখছি। এদের আচার-আচরণ এত অভিজাত, আড়ালে থাকা অপরাধীকে শনাক্ত করা যাচ্ছে না। সবাই যেন একটা করে মুখোশ পরে আছে।"

"এই তালিকায় কি আপনি ডাঃ অজিত রায়কে রাখছেন? ওঁকে কিন্তু বেশ ক্লিন কাট মনে হল।" মন্তব্য করে ঝিনুক।

"হ্যাঁ, ওঁকেও রাখছি। কারণ উনিও অসৎ উপায়ে কনসেপ্ট হাতিয়েছেন। আর-একটা জায়গায় কনফিউশন আছে। উনি বলছেন টাকা দিয়ে অ্যাড কপি কিনেছেন, আর্টলাইনের মালিক বলছেন, টাকা দিতে হয়নি। সত্যিটা বোঝা মুশকিল। সন্দেহের তালিকায় থেকে যাচ্ছেন সবাই।"

"বুঝলাম। তারপর?" বললেন বাবা।

দীপকাকু বলতে থাকেন, "মূল অপরাধী অবশ্যই একজন উঁচুদরের ম্যাথমেটিশিয়ান। নির্ভুল ছক কষে ধাপ্পা দিচ্ছে সকলকে। আমাকেও তাই অঙ্কের ফাঁদ পাততে হবে।"

"ঠিক ক্লিয়ার হল না।" বলে ঝিনুক।

boierpathshala.blogspot.com

"অঙ্কের জগতে ফ্যালাসি বলে একটা ব্যাপার আছে। ভুল যুক্তিতে অঙ্ক মেলানো হয়।"

"যেমন?" জানতে চান বাবা।

দীপকাকু বলেন, "ধরুন, এক অ্যারাবিয়ান উইল করে গিয়েছেন, আমি মারা গেলে আমার সম্পত্তির হাফ পাবে বড়ছেলে, মেজো পাবে ওয়ান থার্ড, ছোট ওয়ান নাইন্‌থ।"

"বেশ।" বললেন বাবা।

দীপকাকু ফের শুরু করেন, "লোকটি মারা যেতে দেখা গেল, তাঁর সম্পত্তি বলতে, সতেরোটা উট। ভাগ করা যাচ্ছে না।"

ঝিনুক চট করে ভেবে নেয়, সত্যিই ভাগ অসম্ভব। সতেরোকে হাফ করতে গিয়ে থেমে যেতে হচ্ছে।

দীপকাকু বলে যাচ্ছেন, "তিন ছেলে সতেরোটা উট নিয়ে গেল কাজির কাছে। বলল, 'আপনি এই সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান করে দিন।' কাজি বললেন, 'এ-আর এমন কী কঠিন ব্যাপার? ওরে কে আছিস, আমার উটশালা থেকে একটা উট নিয়ে আয় তো!'

"তিন ছেলেই রাজি নয়, বলে, 'না না, এ হতে পারে না। বাবা আমাদের যা দিয়ে গিয়েছেন, তাই ভাগ করে নেব। আপনার দাক্ষিণ্য নিতে পারব না।' কাজি বললেন, 'তাই হবে। একটু সবুর করো।' কাজির উট নিয়ে আসা হল। মোট আঠারোটা। হাফ, অর্থাৎ ন'টা উট দিলেন বড়ছেলেকে। একের তিন, মানে ছ'টা দিলেন মেজোকে। ওয়ান নাইন্‌থ পাবে ছোট ছেলে, দু'টো উট। যোগফল সতেরো। কাজির উট রয়ে গেল। কাজের লোককে ডেকে বললেন, 'যা, এটাকে রেখে আয় উটশালায়।'"

বিস্মিত চমকে বাবা বলে উঠলেন, "তাই তো, কী করে মিলল হিসেবটা!"

ঝিনুকের অবস্থা বাবার মতোই। মিটিমিটি হেসে দীপকাকু বললেন, "মিলে তো গিয়েছে। কোনও ভুল নেই।"

"তুমি কি এরকমই কোনও অঙ্কের ধাঁধায় ফেলতে চাইছ অপরাধীকে?" জানতে চান বাবা।

"ঠিক ধরেছেন।"

"সেই জন্যেই কি তোমার ব্ল্যাকবোর্ডে অত অঙ্ক কষা দেখলাম?"

"এটাও ঠিক।"

"আর-একটা প্রশ্ন করব?" বিনয়ের সঙ্গে অনুমতি চান বাবা।

দীপকাকু বলেন, "একটা কেন, দশটা করুন।"

"না, মানে, এই প্রশ্নটা একটু অপ্রাসঙ্গিক, তবু করেই ফেলি, খাতা-পেন, কম্পিউটার থাকতে, তুমি কেন ব্ল্যাকবোর্ডে অঙ্ক করো?"

ছুটন্ত গাড়ির জানলার বাইরে তাকান দীপকাকু। উদাস দৃষ্টি নিয়ে বলতে থাকেন, "স্কুলে পড়ার সময় থেকে দেখে এসেছি, ব্ল্যাকবোর্ডে সব সময় সঠিক অঙ্ক করা হয়। অঙ্কের পবিত্র স্থান ওই বোর্ড। তাই ওটাই ব্যবহার করি।"

বাবা এমনভাবে দীপকাকুর দিকে তাকিয়ে আছেন, যেন কোনও মহান পির বা সাধুবাবাকে দেখছেন।

উটের অঙ্কটা পুরোপুরি মগজ দখল করে নিল ঝিনুকের। ভুল অঙ্ক অথচ কী অদ্ভুতভাবে মিলে গেল হিসেবটা! উলটেপালটে দেখেও যুক্তির কোনও ফাঁক দেখতে পাচ্ছে না ঝিনুক। ভাবতে-ভাবতে আরবের মরুগ্রামে পৌঁছে গিয়েছে। অন্তরচোখে দেখতে পাচ্ছে, সতেরোটা উট নিয়ে তিন ছেলে কাজির কুটিরে এসে দাঁড়াল। দিগন্ত বিস্তৃত বালিতে সোনা রং ছড়িয়ে অস্ত যাচ্ছে সূর্য। তিন ছেলের ডাকাডাকিতে কাজি এসে দাঁড়ালেন বারান্দায়। দাড়িটুকু বাদ দিলে কাজিসাহেবকে দেখতে অনেকটা দীপকাকুর মতো। ভারী চশমাটা অবশ্য নেই... ভাবনাটা হোঁচট খেল অ্যারোর রিসেপশনে এসে। এইটুকু সময় ঝিনুক ভুলেই গিয়েছিল তারা কোনও কাজে বেরিয়েছে। রিসেপশনিস্ট মহিলা আজও ঝিনুকের দিকে তাকিয়ে মিষ্টি করে হাসছেন। হাসি ফেরত দিতে পারে না ঝিনুক। মনে পড়ে দীপকাকুর কথা, ইনিও ষড়যন্ত্রকারিণী হতে পারেন। ঝিনুকদের বাড়ির ফোন নম্বরটা নিয়েছিলেন ট্যাক্টফুলি।

আজ আর ইন্টারকম তুলে মালিকের অনুমতি নিলেন না ভদ্রমহিলা। দীপকাকুকে বললেন, "আপনারা ভিতরে যান।"

মালিকপক্ষ সম্ভবত বলে রেখেছিল, দীপকাকু আসবেন। ডিরেক্টরদের চেম্বারের দিকে যেতে-যেতে ঝিনুক লক্ষ করল, গত বারের মতো স্টাফরা যে-যার নিজের কাজে মশগুল। চুরির ঘটনাটা এদের মনে হয় জানানো হয়নি।

ঘরে ঢুকে তিন পার্টনারকে একসঙ্গে পাওয়া গেল। বসে আছেন সেক্রেটারিয়ট টেবিলের ও-প্রান্তের চেয়ারে। মুখে নেমে এসেছে গাঢ় ছায়া। পিছনের দেওয়ালে ওয়ালফিট লকারটার পাল্লা খোলা। আগের দিন এই লকারটা বন্ধ অবস্থায় দেখেছিল ঝিনুক।। ভিতরটা আজ খাঁ খাঁ করছে।

ঝিনুকদের দেখে তিন পার্টনার উঠে দাঁড়াতে যাচ্ছিলেন। দীপকাকু হাতের ইশারায় বসতে বলে, নিজে বসলেন বিশাল টেবিলের এ-প্রান্তে। দেখাদেখি ঝিনুক আর বাবা বসলেন ফাঁকা দু'টো চেয়ারে। তিনজনের উদ্দেশে দীপকাকু বললেন, "আমাকে প্রথমে কয়েকটা কথা জানতে হবে।"

গৌতমবাবু বললেন, "বলুন।"

"লকারে কী কী ছিল?"

"বিশেষ কিছু না। কোম্পানির কিছু জরুরি কাগজপত্তর। আমাদের খানছয়েক পুরনো কাজের সিডি, যেগুলো বিশেষ কারণে গুরুত্বপূর্ণ আর হাজার তিরিশ ক্যাশ।" বললেন গৌতমবাবু।

"এই চুরির ঘটনায় কতটা ক্ষতি হল কোম্পানির?"

"সত্যি কথা বলতে কী, লস হয়েছে ওই টাকাটাই। বাকি যা চুরি হয়েছে, সব কিছুরই কপি আমাদের আছে।"

"চুরির উদ্দেশ্য কি তা হলে ওই টাকাটাই?"

"বলতে পারছি না। হয়তো তাই।" এতক্ষণ উত্তর দিচ্ছিলেন গৌতমবাবু। এবার পার্থবাবু বলে ওঠেন, "এই চুরির ফলে সবচেয়ে বড় যেটা ক্ষতি হয়েছে, আমরা আর একে অপরকে বিশ্বাস করতে পারছি না।"

বাবা হঠাৎ মাঝখানে বলে ওঠেন, "বিশ্বাসটাই তার মানে চুরি গিয়েছে বলুন!"

"ঠিক তাই। এতদিন অন্য চুরিগুলোর মধ্যে বাইরের লোকের উপস্থিতির আশঙ্কা কিছুটা হলেও ছিল।

"এই চুরিতে একেবারেই নেই।" বললেন পার্থবাবু।

দীপকাকু বলেন, "আমি বুঝতে পারছি, কেন এতটা নিশ্চিত হয়ে কথাটা আপনি বলছেন। লকারের নম্বরটা জানতেন শুধু আপনারা তিনজন। কিন্তু আমার কথা হচ্ছে, সংখ্যাটা যদি ভুলে যান, এই ভয়ে আপনারা কোথাও সেটা নোট করে রাখেননি তো?"

"না। রাখিনি। একসঙ্গে তিনজনের ভুলে যাওয়া তো সম্ভব নয়। এই তো ক'দিন আগে লকার খুলতে গিয়ে সুজয় নম্বরটা মনে করতে পারছিল না। আমি বলে দিলাম।"

পার্থবাবুর কথা শেষ হতেই দীপকাকু দৃষ্টি ঘুরিয়ে সুজয়বাবুকে প্রশ্ন করলেন, আপনি নম্বরটা ভুলে গিয়েছিলেন কেন? কোনও ব্যাপারে মানসিক চাপে রয়েছেন কি আপনি?"

"সে তো রয়েইছি। যা চলছে কোম্পানির উপর দিয়ে। তবে লকারের নম্বর ভোলার আসল কারণ ওটা নয়। সাধারণত লকারটা আমি খুলিই না। অলিখিতভাবে ওটার দায়িত্ব পার্থর। তাই নম্বরটা ওর কাছে জেনে নিয়েছিলাম।"

"দায়িত্ব যখন পার্থবাবুর, আপনি খুলতে গিয়েছিলেন কেন?"

দীপকাকুর এই প্রশ্নটায় বেশ ভালই খোঁচা ছিল। পার্থবাবু, গৌতমবাবু দু'জনেই সন্দিগ্ধ চোখে তাকালেন বন্ধু সুজয়বাবুর দিকে। মাথা নিচু করে নিয়েছেন সুজয়বাবু। ধীরে-ধীরে বললেন, "লকারে আমাদের পার্টনারশিপ ডিড ছিল। বিজনেসে যা সব ঘটছে, একবার দেখে নিলাম উইল যথাস্থানে আছে কি না? বয়ানে কোনও কারিকুরি করা হয়নি তো?"

boierpathshala.blogspot.com

"তার মানে উইলটাও চুরি গিয়েছে?" আতঙ্কের স্বরে বললেন বাবা।

সুজয়বাবু জানালেন, "না যায়নি। সেদিনই আমি উইলটা আলাদা সরিয়ে রেখেছিলাম।"

"সেটা আপনার দুই পার্টনার জানে?"

পার্থবাবু বললেন, "জানি। সুজয় বলেছিল, উইলটা বিশেষ দরকারে ক'দিনের জন্য ওর কাছে রাখবে। আমি না করিনি। আমাদের মধ্যে এই আন্ডারস্ট্যান্ডিংটুকু আছে।"

"এখনও আছে, নাকি ছিল?" কূট প্রশ্ন রাখেন দীপকাকু।

তিন বন্ধু মুখ চাওয়াচাওয়ি করলেন। তিনজনের দৃষ্টিতে কুণ্ঠা, অভিমান একসঙ্গে। সামান্য বিরতিটুকু দিয়ে দীপকাকু বলেন, "ছিল, আজকের ঘটনার পর আপনাদের আর সেই বোঝাপড়া নেই।"

পার্টনারদের থেকে কোনও উত্তর আসে না। দীপকাকুর চোখে চোখও রাখছেন না তিনজনে। নড়েচড়ে বসে দীপকাকু বলতে শুরু করেন, "আপনারা একটা বিষয় খেয়াল রাখবেন, অপরাধীর মূল উদ্দেশ্য, পার্টনারশিপ ব্রেক করে কোম্পানিটা তুলে দেওয়া। আপনারা নিজেদের মধ্যে মনকষাকষি শুরু করলে অপরাধীর কাজ আরও সহজ হয়ে যাবে।"

পার্থবাবু বলেন, "কালপ্রিট তো আমাদের মধ্যেই একজন, কী করে মিলেমিশে থাকব?"

"অপরাধীকে এখনও যখন চিহ্নিত করা যায়নি, জোর দিয়ে বলা যায় না, সে আপনাদের মধ্যে আছে, নাকি বাইরের কেউ? এমনও হতে পারে, চতুর্থ কোনও ব্যক্তির সঙ্গে আপনাদের একজন হাত মিলিয়ে থাকতে পারে।" বলতে-বলতে চেয়ার ঠেলে উঠে দাঁড়ালেন দীপকাকু। প্রসঙ্গ ঘুরিয়ে বলেন, "ওসব কথা এখন থাক। আমি আপাতত কিছু রুটিন ইনভেস্টিগেশন করব।"

টেবিল ঘুরে দীপকাকু পৌঁছলেন লকারের কাছে। বাকিরা একে-একে ঘিরে দাঁড়ালেন অকুস্থল। দেওয়াল ঘেঁষে লকারের নীচে হাঁটু মুড়ে বসে পড়েছেন দীপকাকু। প্যান্টের পকেট থেকে বের করেছেন ম্যাগনিফায়িং গ্লাস। খুঁটিয়ে দেখছেন কার্পেট। একটু পরে উঠে দাঁড়ালেন। পকেট থেকে এবার বেরোল টর্চ। আলো ফেললেন লকারের ভিতরে। ম্যাগনিফায়িং সমেত মাথাটাই ঢুকিয়ে দিলেন সিন্দুকের গহ্বরে। মাথা বের করে পরীক্ষা শুরু করলেন লকারের পাল্লা। জাহাজের স্টিয়ারিংয়ের মতো হ্যান্ডেল লাগানো তাতে। ওটা ঘুরিয়েই লক করা হয় সিন্দুক।

সব কিছু দেখার পর দীপকাকু বললেন, "চুরি যাওয়ার পর আপনারা লকারের বডিতে, ভিতরে, হ্যান্ডেলে হাতটাত দিয়েছেন, তাই না?"

"হ্যাঁ, তা দিয়েছি। আসলে এতটাই হকচকিয়ে গিয়েছিলাম, চোরের হাতের ছাপ মুছে যাচ্ছে, খেয়াল হয়নি কারওই।"

"ঠিক ধরেছেন। আমি হ্যান্ডপ্রিন্টের কথাই বলছিলাম। যদি না চোর গ্লাভ্‌স ব্যবহার করে থাকে।" লকারের পাল্লাটা বন্ধ করে দীপকাকু প্রশ্ন করেন, "এবার আমাকে বলুন, কে প্রথমে লকারটা খোলা অবস্থায় দেখে?"

সুজয়বাবু বললেন, "আমি। দশটা বাজতে পাঁচ-দশ নাগাদ রোজই অফিসে ঢুকি। পার্থ, গৌতম আসে একটু পরে। আজ চেম্বারে পা দিতেই চোখ পড়ে লকারে, একদম হাটখোলা।"

"তারপর কী করলেন?" জানতে চান দীপকাকু।

সুজয়বাবু বলেন, "তক্ষুনি ফোন করলাম পার্থ, গৌতমকে। মিনিট দশেকের মধ্যে ওরা পৌঁছে গেল। তারপরই আপনাকে জানানো হয়।"

"আপনাদের স্টাফদের মধ্যে কতজন প্রেজেন্ট ছিল তখন?"

"কেউ না। শুধু ওয়াচম্যান নরেন্দ্র থাপা ছিল। আমাদের চেম্বার, অফিস ফ্লোর ও-ই ঝাড়পোঁছ করে।"

"চেম্বারটা লক করা থাকে না?"

"থাকে। একটা চাবি দেওয়া আছে থাপার কাছে। ঘর পরিষ্কারের পর সকালের দিকটা খোলাই রাখে থাপা। আমি কিছুক্ষণের মধ্যেই এসে পড়ি।"

"থাপা কি চুরির ঘটনাটা জানে?"

"না, আমরা কোনও স্টাফকেই কিছু বলিনি। আপনার সঙ্গে পরামর্শ করে, যা বলার বলব।"

"থাপাকে একবার ডাকুন।" বলে আপাতত থামলেন দীপকাকু। নিজের চেয়ারে গিয়ে বসলেন। বাকিরা যে-যার নিজের জায়গায় বসেন।

পার্থবাবু ফোন তুলে কোনও স্টাফকে বললেন, "থাপাকে একবার ভিতরে পাঠাও তো!"

এই অবসরে ঝিনুক তিন পার্টনারের বৈশিষ্ট্যগুলো লক্ষ করে। এঁরা সমবয়স্ক হলেও পার্থবাবু বেশ চটপটে। এখনও অনেক ইয়ং। গৌতমবাবু ধীর-স্থির, স্টাইলিশ। চশমার ফ্রেম, শার্ট, টাইয়ের কালার কম্বিনেশন দেখলে সেটা মালুম হয়। সুজয়বাবু তুলনায় বয়স্ক দেখতে, একটু শ্লথ। হয়তো হার্টের অসুখের কারণেই এমনটা হয়েছে। পেসমেকার বসানো আছে বুকে। এঁদের মধ্যে কে হতে পারেন অপরাধী, মোটিভটাই বা কী? ভাবনার মাঝে দরজা আধখোলা করে দাঁড়ায় থাপা, "আসব স্যার।"

"এসো।" বলে ডেকে নেন গৌতমবাবু।

নেপালিদের বয়স বোঝা মুশকিল, তিরিশ থেকে চল্লিশের মধ্যে হবে থাপা। ঘরে ঢুকে একটু থতমত খেয়ে গিয়েছে, এতজন লোকের মাঝে কেন তাকে হঠাৎ ডাকা হল! পর্যায়ক্রমে সবার দিকে ভীরু চাউনিতে তাকাচ্ছে, দীপকাকুর সঙ্গে চোখাচোখি হতেই, দীপকাকু লকারের দিকে আঙুল তুললেন। থাপা তাকাল সেই দিকে। নিমেষে তার মুখ কাগজের মতো সাদা হয়ে গেল।

দীপকাকু সম্ভবত থাপার এক্সপ্রেশনটা দেখার জন্যই এই আচরণ করলেন। এবার প্রশ্নে গেলেন দীপকাকু, "আজ সকালে যখন ঝাড়পোঁছ করছিলে এই ঘর, লকারটা এরকম ছিল?"

"না, স্যার। বন্ধই ছিল। আমার সাফ-সাফ মনে আছে।"

"তা হলে চুরি গিয়েছে ঘর পরিষ্কার করার পর!" যেন নিজেকেই বললেন দীপকাকু। ফের জানতে চাইলেন, "ক'টায় চেম্বার ঝাড়পোঁছ করেছিলে?"

"ন'টা থেকে সাড়ে ন'টার ভিতর স্যার।"

"অফিসে তখন কোনও স্টাফ ছিল?"

"না স্যার। সোনালি ম্যাডাম অন্যদিন দশটার আগে চলে আসেন। আজ এসেছেন সাড়ে দশটায়।"

থাপার কথা শুনে দীপকাকু তাকালেন সুজয়বাবুর দিকে। জিজ্ঞেস করলেন, "সোনালি ম্যাডামের কাজটা কী?"

"আমাদের রিসেপশনিস্ট!" বললেন সুজয়বাবু। দীপকাকু থাপাকে বললেন, "স্টাফদের মধ্যে তুমিই জানলে চুরির ব্যাপারটা, এখন কাউকে কিছু বোলো না, যাও, সোনালি ম্যাডামকে ডেকে দাও।"

থাপা যাচ্ছে না। দাঁড়িয়ে আছে মাথা নিচু করে। ব্যাপারটা কী? ঝিনুক ভাল করে দ্যাখে, থাপার মুখ, এ কী, থাপা তো কান্নার আগের মুহূর্তে চলে গিয়েছে! ধরা গলায় বলছে, "আমি স্যার কিছু..."

দীপকাকু বলে ওঠেন, "আরে, এত ঘাবড়াচ্ছ কেন? তুমি তো কোনও দোষ করোনি। যা বললাম করো।"

চোখ মুছে চেম্বার থেকে বেরিয়ে যায় থাপা। দেখেশুনে যা বোঝা যাচ্ছে, থাপা বেচারি চুরির মধ্যে নেই। তবে বলা যায় না, দীপকাকু বলেছেন, এই কেসের সবাই একটা করে মুখোশ পরে আছে। হয়তো থাপার মুখোশটাই কাঁদছিল। ঝিনুক এবার অপেক্ষা করে সেই ভদ্রমহিলার, যিনি ইতিমধ্যেই সন্দেহের তালিকায় স্থান করে নিয়েছেন।

পুসডোর সামান্য ফাঁক হল। রিসেপশনিস্ট অনুমতি চাইলেন, "মে আই কাম ইন..."

"ইয়েস, কাম।" বলে ডেকে নিলেন পার্থবাবু।

ঘরে এসে দাঁড়ালেন মহিলা। এখন আর ঝিনুককে দেখে হাসার অবস্থা নেই, ঝিনুকই বরং আপাদমস্তক জরিপ করে ওঁকে।

boierpathshala.blogspot.com

দীপকাকুকে দেখিয়ে পার্থবাবু রিসেপশনিস্টকে বলেন, "ইনি আমাদের বন্ধু। বিশেষ দরকারে আমাদের কোম্পানি এঁর সাহায্য নিচ্ছে। উনি কয়েকটা প্রশ্ন করবেন তোমাকে।"

"নিশ্চয়ই বলুন।" সপ্রতিভভাবে বলেন মহিলা। ওঁর সামান্যতম ভ্রুকুটি নেই দেখে বেশ অবাক হয় ঝিনুক।

প্রায় বিনা ভূমিকায় দীপকাকু প্রশ্ন করেন, "আপনার আজ লেট হল কেন অফিসে আসতে? অন্যদিন তো দশটার আগেই চলে আসেন?"

"আজ একটা অদ্ভুত ঘটনা হয়েছে, অফিসের জন্য তৈরি হচ্ছি, হঠাৎ ফোন ছেলের স্কুল থেকে 'তাড়াতাড়ি আসুন। আপনার ছেলের শরীরটা একটু খারাপ হয়েছে।' ছেলের মর্নিং সেকশন। দৌড়লাম স্কুলে। গিয়ে দেখি, কিচ্ছু হয়নি। টিচাররা বললেন, কোনও ফোন করেননি তাঁরা।"

ভদ্রমহিলা থামতে, দীপকাকু বললেন, "ফোনটা কি ল্যান্ডসেটে এসেছিল?"

"হ্যাঁ। কলার আই ডি লাগানো নেই, কোথা থেকে করা হয়েছে ধরতে পারলাম না।"

"কাউকে সন্দেহ হয়?"

ঠোঁট উলটে মাথা নাড়েন মহিলা। দীপকাকু বলেন, "ঠিক আছে, আপনি আসতে পারেন।"

ঝিনুক হতাশ হয়, তার যেন মনে হচ্ছিল প্রশ্নোত্তর পর্ব আরও কিছুক্ষণ চলবে। রিসেপশনিস্ট ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পর দীপকাকু পার্টনারদের কাছে জানতে চান, "আপনাদের অফিসের ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরাগুলোর কন্ট্রোল রুম কোথায়?"

"পাশের ঘরে।" বলে, গৌতমবাবু জানতে চান, "কেন বলুন তো?"

চেয়ার ছেড়ে উঠতে-উঠতে দীপকাকু বলেন, "দেখব আপনাদের রিসেপশনিস্ট এ ঘর থেকে বেরনোর পর কোথায় যাচ্ছেন, কোনও ফোন করছেন কি না?"

"আসুন।" বলে গৌতমবাবু দীপকাকুকে নিয়ে চললেন অ্যান্টি চেম্বারে। দু'জনকে অনুসরণ করে ঝিনুক।

একফালি ঘর, ছ'টা ক্যামেরার ছ'টা মনিটর সেল্‌ফে রাখা। সামনে চেয়ার। এখানে বসে কে ঢুকছে, বেরোচ্ছে, স্টাফরা ফাঁকি দিচ্ছে কিনা সমস্ত দেখা যায়। তবে এ-সবই বজ্র আঁটুনি ফসকা গেরো।

কোম্পানির অতি গোপন খবরও বাইরে চলে যাচ্ছে! ছ'টা মনিটরের পরদায় অফিসের সবক'টা জোন দেখা যাচ্ছে এখন। রিসেপশনিস্ট গেলেন কোথায়? একটু অপেক্ষার পর দেখা গেল, মহিলা রুমালে মুখ মুছতে-মুছতে কাউন্টারে গিয়ে বসলেন। চোখে-মুখে জল দিতে গিয়েছিলেন মনে হয়। কিছুক্ষণ শূন্যদৃষ্টিতে বসে থাকার পর চুলে আঙুল ডুবিয়ে মাথা নিচু করে রইলেন।

পরদার দিকে তাকিয়ে থেকে দীপকাকু বললেন, "খুবই আপসেট হয়ে আছেন মহিলা। বুঝতে পারছেন না, সকাল থেকে যা-যা ঘটছে, কেন ঘটছে? এঁকে সন্দেহের তালিকার বাইরেই রাখতে পারি আমরা। অপরাধীর সঙ্গে এঁর কোনও যোগাযোগ নেই।"

পাশ থেকে গৌতমবাবু বলেন, "চুরির টাইমিং একদম নিখুঁত! সোনালিকে লেট করিয়ে, সুজয় ঢোকার দশ মিনিট আগে, যখন আমাদের ক্যামেরা অন থাকে না, ঠিক তখনই। ভিতরের লোক ছাড়া কেউ এই ফাঁকটা খুঁজে পাবে না।"

কোনও উত্তর দিলেন না দীপকাকু। কন্ট্রোল রুম থেকে বেরিয়ে যেন চেম্বারের নির্দিষ্ট চেয়ারে গিয়ে বসলেন। ঘরের সবাই অধীর আগ্রহে তাকিয়ে আছেন দীপকাকুর দিকে। গভীর চিন্তামগ্ন দীপকাকু একটু পরে বলেন, "যেসব জিনিস চুরি গিয়েছে, তার একটা লিস্ট আমাকে দিন।"

"লিস্ট আমার করাই আছে।" বলে পার্থবাবু একটা কাগজ এগিয়ে দেন দীপকাকুর দিকে। লিস্টে চোখ বোলাতে-বোলাতে দীপকাকু বলেন, "আপনারা যদি মনে করেন, চুরির ব্যাপারে পুলিশের সাহায্য নেবেন, নিতে পারেন।"

"আপনি যেমন বলবেন। পুলিশের কাছে যাওয়ার খুব একটা ইচ্ছে নেই আমাদের। লোক জানাজানি হবে। বদনাম হবে কোম্পানির।" বললেন গৌতমবাবু।

"তা হলে থাক।" বলে লিস্ট পকেটে পুরলেন দীপকাকু। এবার সুজয়বাবুর দিকে তাকিয়ে বললেন, "পার্টনারশিপের উইলটা কি এখন সঙ্গে আছে আপনার?"

"হ্যাঁ, আমার ব্রিফকেসেই আছে।"

"একবার দেখতে পারি?"

"অবশ্যই।" বলে সুজয়বাবু ব্রিফকেস থেকে উইলটা বের করে দীপকাকুর হাতে দেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই দীপকাকু ডুবে যান উইলের মধ্যে।

ভবানীপুরের একটা চায়ের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে ঝিনুকদের টিম শিঙাড়া খাচ্ছে। অ্যারোর অফিস থেকে বেরনোর পর বাবা বলেছিলেন, "দীপঙ্কর, তোমার কেসের ঝামেলায় আজ ব্রেকফাস্টটা স্কিপ হয়ে গিয়েছে। ভীষণ খিদে পাচ্ছে এখন।"

তখনই এই দোকানের হদিশ দেন দীপকাকু। বলেন, "চলুন, ভবানীপুরে একটা দোকানে দারুণ শিঙাড়া করে, আমি খাওয়াব।"

শিঙাড়ার টেস্ট সত্যিই খুব ভাল। সমস্যা একটাই, বসার জায়গা নেই দোকানে, ফুটপাতে দাঁড়িয়ে খেতে হয়।

গরম শিঙাড়া ঠিক ম্যানেজ করে উঠতে পারছে না ঝিনুক। আশুদা ইতিমধ্যে তিনটে সাবাড় করে দিয়েছে। ঝালে-গরমে বাবার অবস্থা বেশ কাহিল। জিভ শুলিয়ে দীপকাকুকে বললেন, "আমি একটা জিনিস বুঝতে পারছি না, তুমি কেন সুজয় ঘোষকে গার্ড করছ। উনিই কেসটা তোমাকে দিয়েছেন বলে!"

উত্তরে দীপকাকু হাসেন। বাবা আবার বলেন, "আজকের ঘটনায় স্পষ্ট ওঁকে দায়ী করা যায়। উনি কাউকে দিয়ে ফোন করিয়ে সোনালিকে লেট করিয়েছেন। মিনিটদশেক আগে অফিসে ঢুকে সেরেছেন কাজটা।"

"বুঝলাম। কিন্তু ওঁর মোটিভটা কী?" জানতে চাইলেন দীপকাকু।

বাবা বলেন, "ওই একই। নিজেদের মধ্যে গণ্ডগোল পাকিয়ে কোম্পানিটা তুলে দেওয়া।"

"সেটাই বা করতে চাইছেন কেন?"

বাবা নিরুত্তর। দীপকাকু বলতে থাকেন, "এইসব কাণ্ডের আসল উদ্দেশ্য যতক্ষণ না আমি জানতে পারছি, কাউকে দায়ী করা যাচ্ছে না। গভীর কোনও রহস্য লুকিয়ে আছে এই কেসের অন্তরালে। যার তল খুঁজে পাচ্ছি না আমরা।"

দীপকাকুর সেলফোনে রিং হচ্ছে। এত অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছেন, খেয়ালই করছেন না। ঝিনুক বলে দেয়, "ফোন ধরুন।"

অপ্রতিভ দীপকাকু পকেট থেকে ফোন বের করে কানে নেন। ও-প্রান্তের কথা খানিকটা শোনার পরই, সেটটা বাবার কানে চেপে ধরেন। এই অদ্ভুত আচরণের মানে খুঁজে পায় না ঝিনুক। সেকেন্ডখানেক পরে বাবা মাথা নাড়েন। ও-প্রান্তের কথা শেষ হল মনে হয়। দীপকাকু ফোনটা ফেরত নিয়ে স্ক্রিনে চোখ রাখেন। বাবাকে বলেন, "গলাটা কি চিনতে পারলেন? সকালের হুমকিটা কি ইনিই দিয়েছিলেন?"

"মনে হচ্ছে তো সেই লোকটাই। তবে গলাটা এখন বদলে ফেলার চেষ্টা করেছে।"

"কারণ, ফোনটা উনি আমাকে করেছিলেন। ওঁকে সম্ভবত আমি চিনি।"

বিষম কৌতূহলে ঝিনুক জানতে চায়, "কী বললেন ফোনে?"

"গোয়েন্দাবাবু, কী বুঝছ, পারবে কেসটা সল্‌ভ করতে? বাকি কথা শুনেছেন রজতদা।" বললেন দীপকাকু। বাবা বলেন পরবর্তী অংশ, এককালীন হাজার পঞ্চাশ পাবে, বলো তো আরও পাঁচ বাড়িয়ে দিতে পারি। কেসটা ছেড়ে দাও। কখন কোথায় টাকা পাঠাতে হবে বলো?"

বাবার বলা শেষ হতে দীপকাকু ফোনের স্ক্রিন থেকে চোখ তুলে বলেন, "গড়িয়ার বুথ থেকেই করা হয়েছে ফোন।"

boierpathshala.blogspot.com

রিস্ট তুলে ঘড়ি দেখেন বাবা। বলেন, "হ্যাঁ, পঞ্চাশ মিনিট মতো হল, আমরা অ্যারোর অফিস থেকে বেরিয়েছি। এর মধ্যে তিন পার্টনারের কোনও একজন ইজিলি গড়িয়ায় পৌঁছে তোমাকে ফোন করতেই পারে।"

বাবার কথা শুনতে-শুনতে সেলফোনের বোতাম টিপছিলেন দীপকাকু, এবার কানে নিলেন। ও-প্রান্তের কাছে জানতে চাইলেন, সুজয় ঘোষ, পার্থ বর্মন, গৌতম মজুমদারের মধ্যে কেউ অফিসে আছেন কিনা?

সম্ভবত অপারেটরকে ফোন করেছেন দীপকাকু। ও-প্রান্তের কথা শুনে ফোন পকেটে পুরলেন। ঝিনুক জিজ্ঞেস করে, "কী বলল?"

হতাশ ভঙ্গিতে দীপকাকু বলেন, "মিনিট পঁয়তাল্লিশ হতে চলল, তিনজনই বেরিয়ে গিয়েছেন অফিস থেকে। আমি চাইছিলাম, একজন বেরোক অথবা কেউ না বেরোক।"

বাবা বলেন, "একজন বেরনোটা তো বুঝলাম, ফোনটা হয়তো সে-ই করেছে। কেউ না বেরোক—এটা চাইছ কেন?"

"চতুর্থ ব্যক্তির খোঁজে। যিনি ফোনটা করেছেন, মার্জিত উচ্চারণ, বয়সে আমার চেয়ে বড়, 'তুমি' করে কথা বললেন ফোনে। সম্ভবত ইনিই অপরাধী অথবা তিন পার্টনারের একজনের সঙ্গে হাত মিলিয়েছেন।"

দীপকাকুর অনুমান-ক্ষমতা দেখে প্রতিবারের মতোই বিস্মিত হয় ঝিনুক। মার্জিত উচ্চরণের ফোন সকালে বাবার কাছেও এসেছিল। যা দেখা যাচ্ছে, অপরাধী নাগালের মধ্যে এসে গিয়েছে। তিন পার্টনার অফিস থেকে বেরিয়ে গিয়ে ব্যাপারটা গুলিয়ে দিলেন।

চা নিয়ে এসেছে দোকানের কাজের ছেলে। ভাঁড় হাতে তুলে দীপকাকু বলেন, "চা খেয়ে চলুন যাওয়া যাক গড়িয়ার ফোন বুথে।"

"এখন গিয়ে কী হবে, পাখি তো হাওয়া!" বললেন বাবা।

দীপকাকুর মুখে চাপা হাসি। বলেন, "গিয়ে দেখি, যদি কোনও পালক পড়ে থাকে।"

হেঁয়ালিটা বাবা ধরতে পারলেন কিনা বোঝা গেল না। মন দিয়েছেন চা খাওয়ায়। ঝিনুক বুঝতে পারে, পালক অর্থাৎ কোনও প্রমাণ ফেলে যাওয়ার কথা বলছেন দীপকাকু।

দুপুর বলে গড়িয়ার এই রাস্তাটা আজ যেন আরও বেশি নির্জন। দীপকাকুর নির্দেশমতো বুথের একটু আগে গাড়ি দাঁড় করাল আশুদা। সামনে দিয়ে দাঁড়ালে বুথ অ্যাটেনডেন্ট ঘাবড়ে গিয়ে কথাই বলতে পারত না। একটু বোকাসোকা ধরনের ছেলেটা।

কাচঘেরা ফোনের ঘরটায় ঝিনুকের বয়সি একটা মেয়ে হেসে-হেসে কথা বলে যাচ্ছে। আন্দাজ করা যায়, কথা চলছে অনেকক্ষণ ধরে। অ্যাটেনডেন্ট নিজের জায়গায় বসে ঝিমোচ্ছে।

ঝিনুকরা সামনে গিয়ে দাঁড়াতে নড়েচড়ে বসে ছেলেটা। আগের আলাপে ছেলেটাকে নিজের আসল পরিচয় দিয়ে রেখেছিলেন দীপকাকু। সেই কারণেই ছেলেটা আজ শশব্যস্ত হয়ে উঠে দাঁড়াল। বলল, "বসুন না স্যার!"

দীপকাকু চেয়ারটা বাবাকে ছেড়ে দিয়ে ছেলেটাকে প্রশ্ন করলেন, "সকাল থেকে ক'জন কলার এসেছে বুথে?"

"দশ-বারোটা হবে স্যার। মেশিন দেখে বলে দিতে পারি।"

"দরকার নেই। আমাকে বলো, ঘণ্টাদেড়েক আগে কোনও বয়স্ক লোক ফোন করতে এসেছিলেন?"

একটু ভেবে ছেলেটি বলে, "এসেছিলেন স্যার, গাড়ি করে।"

"কী গাড়ি?"

"অ্যাম্বাসাডর, সাদা। লোকটার মোবাইল বোধ হয় কাজ করছিল না। ফোন টিপতে-টিপতে বেরিয়ে এলেন গাড়ি থেকে। বুথে ঢুকে ফোন করলেন।"

"কল কতক্ষণের ছিল?"

"একটা পাল্‌স স্যার।"

"লোকটাকে দেখতে কেমন একটু বলো।"

ছেলেটি যা বলল, তিন পার্টনারের সঙ্গেই মিলে যায়। দীপকাকু সন্তুষ্ট হলেন না। বললেন, "গাড়িটার কোনও স্পেশ্যালিটি, আঁচড়ের দাগটাগ..."

কপাল কুঁচকে অনেক ভেবে ছেলেটা বলে, "গাড়ির নম্বর বাংলায় লেখা।"

"ড্রাইভার ছিল নাকি নিজেই ড্রাইভ করছিলেন?"

প্রশ্নবাণে ছেলেটা ক্লান্ত। বলে, "মনে করতে পারছি না স্যার!"

বাবা হঠাৎ ধমকে ওঠেন, "নম্বর দেখতে পেলে, ড্রাইভারকে দেখতে পেলে না?"

নার্ভাস হয়ে ছেলেটা আমতা-আমতা করছে, হাত দু'টো জড়ো করে, অকারণেই নমস্কারের ভঙ্গি করে ফেলেছে। দীপকাকু সামাল দেন। ছেলেটার পিঠে হাতে দিয়ে বলেন, "একটু মনে করার চেষ্টা করো তো, ভদ্রলোক এর আগে একই রকমভাবে, ফোনে লাইন পাচ্ছেন না এই অজুহাতে তোমার বুথে এসেছিলেন কিনা?"

ছেলেটার মুখ মুহূর্তে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, "এসেছিলেন স্যার, তখন ড্রাইভার ছিল।"

"ড্রাইভারের চেহারাটা মনে করতে পারবে?" জানতে চান দীপকাকু।

বিষণ্ণ মুখে মাথা নাড়ে ছেলেটি। বলে, "গাড়ির জানলা দিয়ে কতটুকু আর দেখা যায় বলুন!"

দীপকাকু কার্ড বের করে ছেলেটিকে দেন। বলেন, "ভদ্রলোককে কখনও যদি দেখতে পাও, সঙ্গে-সঙ্গে একটা ফোন কোরো আমাকে।"

বুথের সামনে থেকে ফিরে যাওয়ার সময় ঝিনুক দ্যাখে, তার বয়সি মেয়েটা এখনও কথা বলে যাচ্ছে। এইসব অনর্গল-ভাষিণীর জন্যই নিরালা জায়গাতেও বুথটা টিকে আছে।

গাড়িতে বসে দীপকাকু বললেন, "সাদা অ্যাম্বাসাডর, মার্জিত উচ্চারণ, বাংলায় লেখা গাড়ির নম্বর। অপরাধীর রুচি আছে বলতে হবে!"

॥ ৬ ॥

চারটে দিন কেটে গেল। এই ক'দিন ঝিনুককে একদম নিষ্ক্রিয় করে রাখলেন দীপকাকু। তদন্তের অগ্রগতি সম্বন্ধে তেমন কিছু জানা যাচ্ছে না। বাবাও কেমন যেন উৎসাহ হারিয়েছেন অ্যারোর ব্যাপারে। প্রসঙ্গ তুললে বলছেন, "যত সব বোগাস কেস। তিনজন শিক্ষিত বয়স্ক লোক নিজেদের মধ্যে খেয়োখেয়ি করে ব্যবসা তুলে দেওয়ার বন্দোবস্ত করছে, আমরা কেন খামোকা মাথা খাটিয়ে মরব! এমনিতে বাইরের লোক বদনাম করে, বাঙালির দ্বারা ব্যবসা হয় না। ওঁরা সেটা আরও প্রমাণ করে ছাড়ছেন।"

"তুমি তা হলে বলছ, কেসটা দীপকাকুর ছেড়ে দেওয়া উচিত?" বলেছিল ঝিনুক।

বাবা বলেন, "অবশ্যই। তবে পঞ্চাশ হাজার টাকার টোপটা গিলে নিয়ে। তিনজনের মধ্যে যিনি টাকাটা দিতে চাইছেন, ব্যবসা উঠে গেলে কোনও না-কোনওভাবে লাভবান হবেন।"

বাবার দৃঢ় বিশ্বাস, ওই তিন পার্টনারের মধ্যে একজন অপরাধী। সুযোগ বুঝে ফেভারিট দেশটার কথাও তুললেন, "এই কেসটাই যদি জাপানে হত, দু'দিনের বেশি সময় লাগত না সল্‌ভ করতে।"

"কীভাবে?" বাবা বানিয়ে কিছু বলবেন জেনেও, জিজ্ঞেস করেছিল ঝিনুক। বাবা নির্বিধায় বলেন, "ওদেশে ফোনের গলা শুনে, মানুষটার ছবি আঁকার মেশিন বেরিয়ে গিয়েছে। তোদের কেসের কালপ্রিট কবে ধরা পড়ে যেত!"

"ইনফরমেশনটা কোথায় পেলেন?" চেপে ধরেছিল ঝিনুক। সঙ্গে-সঙ্গে কল্পনার ডানা গুটিয়ে বাবা বলেছিলেন, "মেশিনটা এখনও পরীক্ষামূলক অবস্থায় আছে।"

বাবার সঙ্গে আলোচনা করে কোনও লাভ হবে না বুঝে ঝিনুক ফোন করেছিল দীপকাকুকে, "তদন্তের কতদূর কী এগোল, কিছু

boierpathshala.blogspot.com

বলছেন না তো!"

দীপকাকু বলেন, "তদন্ত মোটামুটি শেষ। অপরাধীকে ধরার জন্য অঙ্কের ফাঁদ পাতছি এখন।"

ঝিনুকের ডায়েরিতে কেসের সবিশেষ লেখা আছে, চোখ বুলিয়ে ঝিনুক পেয়েছে দু'টো ইমপর্টান্ট পয়েন্ট, যার অনুসন্ধান এখনও বাকি। ফোনে পয়েন্ট দু'টো মনে করিয়ে দেয় দীপকাকুকে। এক নম্বর, গ্লাস এবং হ্যান্ডবিলের হাতের ছাপ কি একই লোকের?

দীপকাকু বলেন, "হ্যাঁ, ল্যাবের রিপোর্ট তাই বলছে। পয়েন্ট নম্বর টু, তিন পার্টনারের মধ্যে কারও কি সাদা অ্যাম্বাসাডর আছে?"

দীপকাকু উত্তর দেন, "না, নেই। আমি খোঁজ নিয়ে দেখেছি।"

সত্যিই অনুসন্ধানের আর তেমন কিছুই বাকি নেই, যদি না এর মাঝে কোনও ঘটনা ঘটে। ঝিনুক জানতে চেয়েছিল, "আমাদের এর পরের স্টেপ কী হবে?"

"ফাঁদটা ভাল করে গুছিয়ে নিই, তোমাকে ডেকে পাঠাব।"

আজ পঞ্চম দিন। সকালে ফোন এসেছিল দীপকাকুর, 'গ্রিনপ্লেস' হোটেলে আসতে বললেন। বাইশ নম্বর রুমে তিন পার্টনারকে নিয়ে গোপন মিটিং হবে। "রজতদা যদি রাজি থাকেন, নিয়ে এসো," বলেছিলেন দীপকাকু।

বাবা আসতে চাননি। বলেছেন, "তুই আশুকে নিয়ে চলে যা। গ্রিনপ্লেস দামি হোটেল, ট্যাক্সি থেকে নামলে ঠিক মানাবে না।"

দুরুদুরু বুকে গাড়িতে বসে আছে ঝিনুক। গ্রিনপ্লেসের মতো অভিজাত হোটেলে একা-একা যাওয়া মুখের কথা নয়। দীপকাকু না অদ্ভুত! কখনও ঝিনুককে ছোট্ট মেয়ে বলে গণ্য করেন, কখনও লেডি। ফোনে ঝিনুক বলেছিল, "আপনি আমাদের বাড়ি হয়ে যান, একসঙ্গেই যাব।"

উত্তরে দীপকাকু বলেছিলেন, "আমি জানি, কেন তুমি হেজিটেড করছ। উঁচু মহলে ঢোকার জড়তা তোমাকে কাটাতে হবে। এটাও এক ধরনের ইনভেস্টিগেটরদের শিক্ষা বলতে পার।"

লিন্ডসে স্ট্রিট ডান দিকে রেখে এগিয়ে যাচ্ছে গাড়ি, ঝিনুক মন ঘুরিয়ে নেয় তদন্তের দিকে, আজকের মিটিংটা কীসের, কেনই বা অ্যারোর অফিসের বদলে হোটেলের রুম বেছে নেওয়া হল?

পাঁচতারা হোটেলের জলুস এবং রাশভারী পরিবেশের ভিতর দিয়ে ঝিনুক পৌঁছে গিয়েছে বাইশ নম্বর ঘরে। পরিবেশ যতই গম্ভীর হোক, হোটেলের কর্মীরা অত্যন্ত অতিথিবৎসল।

মিটিং রুমের যে ছবি (আলো-অন্ধকার ঘর) ঝিনুক মাথায় করে এনেছিল, একেবারেই মিলল না। দু'টো বড়-বড় কাচের জানলা, নীচে দেখা যাচ্ছে হোটেলের পুল সাইড। নীল টলটলে জল। এখন অবশ্য কেউ সুইমিং করছে না। তিন পার্টনারসহ দীপকাকু সোফায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে বসে খোশমেজাজে গল্প করছেন। চা, স্ন্যাকস চলছে। ঘরের মাঝে কারুকাজ করা বিশাল টেবিলে প্রচুর কাগজপত্তর।

ঝিনুক সোফায় গিয়ে বসতে দীপকাকুর উদ্দেশে পার্থবাবু বলেন, "আপনার ভাইঝিটি খুবই স্মার্ট অ্যান্ড সিরিয়াস। একে অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে নিয়ে ভালই করেছেন। মহিলা সহকারী খুব একটা দেখা যায় না। নিজেদের পরিচয় গোপন করতে সুবিধে হয় আপনাদের।"

গৌতমবাবু বললেন, "তবে বড্ড অল্প বয়সে চলে এসেছে এই কাজে। কত গুন্ডা-বদমাইশদের সঙ্গে পাল্লা দিতে হয়। ওর তো এখন পড়াশোনা করার বয়স।"

দীপকাকু বলেন, "না, না, ওকে বিশেষ-বিশেষ কেসে সঙ্গে রাখি। মাথাটা শার্প, সাহস আছে, ক্যারাটে, কুংফু জানে। আমার ইচ্ছে, ভবিষ্যতে কলকাতাকে একটা চৌকস লেডি ডিটেকটিভ উপহার দেওয়ার।"

দীপকাকুর ঠাট্টা অনেক সময় ধরা যায় না, এমন সিরিয়াসলি বলেন। প্রসঙ্গ ঘোরায় ঝিনুক। গলা নিচু রেখে দীপকাকুর কাছে জানতে চায়, "হঠাৎ এখানে মিটিং কেন?"

দীপকাকু বলেন, "গোপনীয়তা রক্ষা করার জন্য। দেখা গিয়েছে, অ্যারোর অফিসে বসে যে আলোচনাই হোক, বাইরে বেরিয়ে যাচ্ছে।"

"আজকের মিটিংয়ের অ্যাজেন্ডা কী?"

দীপকাকু বলেন, "সেরকম কিছুই না, আমি ওঁদের বলেছি, আপনাদের হাতে এখন যেসব কাজ আছে, নিয়ে আসুন। ওর মধ্যে থেকে একটা কাজ আমি বেছে নেব। সেই বিজ্ঞাপনটা পার্টিকে পছন্দ করানো থেকে প্রচার করা অবধি আমার দায়িত্ব। অ্যাজ ইফ আমি ফোর্থ পার্টনার। এখানে একটাই শর্ত, অ্যাডটা বাজারে আসার আগে পর্যন্ত আমার সঙ্গে ওই বিষয়ে কথা বলা চলবে না। সম্পূর্ণ ভুলে যেতে হবে।"

ঝিনুক বুঝতেই পারে, অঙ্কের ফাঁদ বিছাতে শুরু করে দিয়েছেন দীপকাকু। তিন পার্টনার অঙ্কের ব্যাপারে কিছুই জানেন না, যে-কোনও মুহূর্তে একজন ফাঁদে পড়তে পারেন। আপাতত মন খুলে গল্প করছেন নিজেদের মধ্যে। ভাবটা এমন যেন চেঞ্জে এসেছেন।

পাখির ডাকের মতো বেল বাজে। কে এল এখন? দরজা খুলতে যান গৌতমবাবু।

রুম সার্ভিসের বয় এসেছে, ট্রের উপর এক গ্লাস শরবত, প্লেটে পেস্ট্রি জাতীয় কিছু। বয় ট্রেটা নামিয়ে রাখে ঝিনুকের পাশে ছোট্ট টুলে। মনে হচ্ছে অর্ডার দেওয়া ছিল, ঝিনুক এলে এটা দিতে হবে।

বয় চলে গেল। দরজা বন্ধ করে গৌতমবাবু বসলেন নিজের জায়গায়। ঝিনুক গ্লাস তুলে নিয়ে সিপ দিচ্ছে, দৃষ্টি যায় সেন্টার টেবিলের কাগজপত্তরে, একটা দারুণ ফোটোগ্রাফ সেখানে।

সোফা থেকে উঠে ফোটোটা নিয়ে আসে ঝিনুক, কালো শু'র মধ্যে বসে একটা বিড়াল আড়মোড়া ভাঙছে। কী কিউট!

দীপকাকু ঝিনুকের হাত থেকে ফোটোটো নিয়ে দেখতে থাকেন। ঝিনুক জিজ্ঞেস করে, "কীসের অ্যাড এটা?"

"নিশ্চয়ই বিড়ালের নয়!" কটাক্ষ করেন দীপকাকু। ওঁর এই এক দোষ, পাঁচজনের সামনে বোকা বানাতে খুব ভালবাসেন।

সুজয়বাবু বসে থেকে হাত বাড়ালেন, "দেখি, কোন ফোটোটা?"

দীপকাকু ফোটোটা ওঁর হাতে দিলেন। সুজয়বাবু দেখার পর বাকি দুই পার্টনারও দেখলেন। দীপকাকু বলতে শুরু করেছেন, "ফোটোটা যখন ঝিনুকের নজর কেড়েছে, এটা নিয়ে কাজে নামব আমি। মনে হচ্ছে, কাস্টমার সহজেই পছন্দ করবে। কোন কোম্পানির জন্য অ্যাডটা তৈরি করছিলেন?"

সুজয়বাবু বলেন, "আমাদের পুরনো ক্লায়েন্ট রোডস্টার কোম্পানি। পুজোর আগে ওরা আমাদের দিয়েই বিজ্ঞাপন করায়।"

"কাজটা কত দূর এগিয়েছে?" জানতে চান দীপকাকু।

উত্তর দেন গৌতমবাবু, "পার্টিকে জুতোর মধ্যে বিড়ালের আড়মোড়া ভাঙার আইডিয়াটা মুখে বলেছিলাম। পছন্দ করেছে। বিভিন্ন অ্যাঙ্গেল থেকে চারটে ফোটো তোলা হয়। ফোটোগুলো এখনও রোডস্টার কোম্পানি দ্যাখেনি।"

"আমি দেখি। আছে এখানে?" বললেন দীপকাকু।

সুজয়বাবু টেবিলের কাগজপত্তর ঘেঁটে বাকি তিনটে ফোটো বের করলেন। প্রায় একই রকম ছবি, অ্যাঙ্গেলগুলো আলাদা, দীপকাকু ফোটোগুলো নিজের কাছে নিয়ে জানতে চাইলেন, "এই বিজ্ঞাপনের কী কী কাজ বাকি আছে?"

গৌতমবাবু বলেন, "ফোটো শুট তো হয়েই গিয়েছে, পার্টি সিলেক্ট করবে, কোন ফোটোটা যাবে বিজ্ঞাপনে। বাকি রয়েছে ক্যাপশন দেওয়া।"

"অ্যাডটা কোন মিডিয়ায় প্রচার হবে? টিভি, নিউজপেপার, হোর্ডিং..."

"কাস্টমার বলে দেবে সেটা," বললেন গৌতমবাবু।

দীপকাকু বলেন, "ঠিক আছে, সে-সব আমি পার্টির থেকে জেনে নেব। আপনারা এখন ক্যাপশন দিন কয়েকটা। দেখি, পার্টি কোনটা পছন্দ করে!"

"এখনই দিতে হবে?" একটু যেন অসহায় কণ্ঠে বলেন সুজয়বাবু। এত তাড়াতাড়ি ভেবে উঠতে হবে বুঝে ভয় পাচ্ছেন মনে হয়।

boierpathshala.blogspot.com

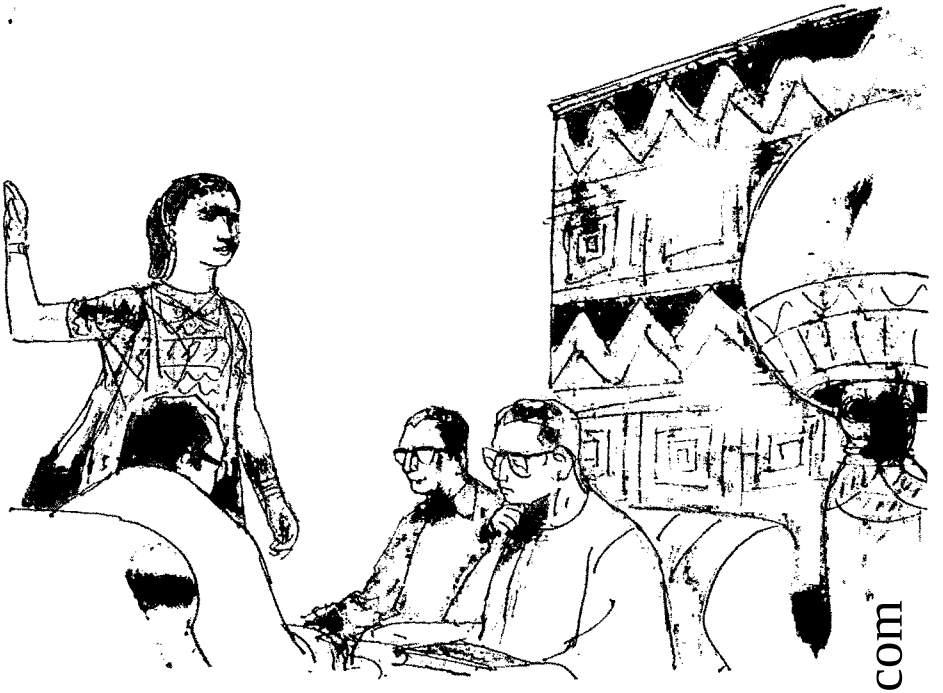

দীপকাকু বলেন, "হ্যাঁ, এখনই ক্যাপশন চাই আমার। এই রুম থেকে বেরনোর সঙ্গে-সঙ্গে আপনারা ভুলে যাবেন অ্যাডটার কথা। বাকি যা করার আমি করব। আপনারা শুধু ফোনে কাস্টমারকে বলে দেবেন, আমাকে প্রতিনিধি হিসেবে পাঠাচ্ছেন। অবশ্যই আমার আসল পরিচয় গোপন রাখবেন।"

দীপকাকুর কথা শেষ হতেই পার্থবাবু বলে ওঠেন, "'বেডরুম কমফোর্ট', কেমন হবে ক্যাপশনটা?"

"দারুণ! গৌতমবাবু, আপনি বলুন।" দীপকাকু যেন ওরাল টেস্টের টিচার।

একটু ভেবে নিয়ে গৌতমবাবু বলেন, "আমার ক্যাচলাইন হচ্ছে— 'আফটার আ নাইস ড্রিম'।"

"এটাও ভাল।" বললেন দীপকাকু। ফোটোগুলো এখন ঝিনুকের হাতে। ক্যাপশন দু'টো আশ্চর্যভাবে ম্যাচ করে গেল। বিজ্ঞাপনের সঙ্গে ওঠাবসা করতে-করতে এঁদের মাথা কাজ করছে প্রায় যন্ত্রের মতো। এবার পালা সুজয়বাবুর। বেশ খানিকক্ষণ ভেবে বললেন, "আমি বাংলায় ক্যাচলাইন দেব।"

"ভালই তো। ভ্যারাইটি হবে।" বললেন দীপকাকু।

"আপনার পা জোড়া/ দেবে শুধু আড়মোড়া।" ছড়া কেটে বললেন সুজয়বাবু। জিজ্ঞেস করলেন, "কেমন লাগল?"

"ভাল, খুব ভাল!" বললেন দীপকাকু। বাকি দুই পার্টনার সায় দিলেন। ঝিনুকেরও সুজয়বাবুর ক্যাপশনটা সবচেয়ে ভাল লেগেছে, বিড়ালের আড়মোড়ার সঙ্গে পায়ের আরাম কী সুন্দর মেলালেন। দৃশ্যত গম্ভীর দেখতে মানুষটির মধ্যে এত মজা লুকিয়ে আছে বোঝাই যায়নি!

"ঝিনুক, তুমি কোনও স্লোগান দেবে?" জিজ্ঞেস করলেন দীপকাকু।

অপ্রস্তুত বোধ করে ঝিনুক, "না, আমি আবার কেন!"

"ট্রাই করো। যাচাই করা যাবে তোমার উদ্ভাবনী ক্ষমতা।"

চেষ্টা একবার করাই যাক, মন দিয়ে চারটে ফোটো বারবার দ্যাখে ঝিনুক। না , কোনও ক্যাপশনই মাথায় আসছে না। সপ্তাহখানেক ধরে ভাবলে হয়তো আসবে।

দীপকাকু বুঝলেন, "ঝিনুকের দ্বারা হবে না। আগের ক্যাপশন তিনটে নোট করে নিলেন একটা কাগজে। তিন পার্টনারের উদ্দেশে বললেন, "তা হলে ওই কথা রইল, এই ঘর থেকে বেরিয়ে আপনারা বিজ্ঞাপনটা ভুলে যাবেন।"

প্রায় একসঙ্গে ঘাড় হেলালেন তিনবন্ধু। ঝিনুকের বুঝতে অসুবিধে হয় না, দীপকাকু অঙ্কের আর-একটা ধাপে গিয়ে পৌঁছলেন।

রুম থেকে বেরনোর আগে আর-এক রাউন্ড চা হল। ঝিনুকের জন্য এসেছিল আইসক্রিম। তিন পার্টনার গাড়ি অবধি পৌঁছে দিলেন ঝিনুকদের। দীপকাকু বাইক আনেননি। পার্থবাবু ওঁকে বাড়ি থেকে তুলেছিলেন।

গাড়ি স্টার্ট দিয়ে মেন রাস্তায় এসে পড়ল আড্ডা। তখনই হাত পিছন করে একটা ভাঁজ করা কাগজ দিল দীপকাকুকে। বলল, "একটু

boierpathshala.blogspot.com

আগে একটা লোক এসে দিয়ে গেল। বলল, আপনাকে দিতে।"

ঝিনুক নিশ্চিত হয়, এটা আর-একটা হুমকির চিঠি। ভ্রূ কুঁচকে কাগজের ভাঁজ খুললেন দীপকাকু। ঝিনুকের আন্দাজ মিলে গেল। আগের মতো কম্পিউটারে বাংলা হরফে লেখা, 'আমি একটা ক্যাপশন দিই। দ্যাখো, পছন্দ হয় কিনা— ইয়োর ফিট/ ডিজার্ভ ইট।'

দীপকাকুকে নিয়ে নিদারুণ মশকরায় মেতেছে অপরাধী। অপমানে থমথম করছে দীপকাকুর মুখ। আশুদাকে জিজ্ঞেস করেন, "কেমন দেখতে লোকটাকে?"

আশুদা যা বর্ণনা দিল, হুবহু মিলে যায় আগের লোকটার সঙ্গে। আর-একবার যদি বাছাধনকে পেয়ে যায় ঝিনুক, মজা বের করে দেবে হুমকির চিঠি দেওয়ার। নার্সিং হোমে একটুর জন্য হাত ফসকে বেরিয়ে গিয়েছিল।

কাগজটা হাতে নিয়ে গুম মেরে বসে আছেন দীপকাকু। তিন পার্টনারের জন্য যে ফাঁদ তিনি পেতেছিলেন, বড়সড় ফাঁক রয়ে গিয়েছে তাতে। ঝিনুক বলে, "তা হলে কি চতুর্থ কোনও ব্যক্তি অপরাধী? কেননা তিন পার্টনারই তো আজ আমাদের সামনে ছিলেন। মিটিংয়ে জুতোর বিজ্ঞাপন নিয়ে কথা হবে, সেটাও তো আগে থেকে ঠিক করা ছিল না। কথাটা বেরোল কী করে?"

চিন্তামগ্ন গলায় দীপকাকু বললেন, "আলোচনা চলাকালীন অন্তত দু'বার গৌতমবাবু টয়লেট যান।"

এবার ঝিনুককে বেশ নিশ্চিন্ত দেখায়, বলে, "তা হলে তো মিটেই গেল। গৌতমবাবুই অপরাধী। টয়লেট থেকে ফোন করে দিয়েছিলেন লোকটাকে, প্রথমবারের হুমকির চিঠির ক্ষেত্রে একই পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছিল।"

"মোটিভটা কী, কেন গৌতমবাবু চাইবেন কোম্পানিটা ডুবে যাক? কী লাভ হবে ওঁর? অপরাধের উদ্দেশ্য যতক্ষণ না জানা যাচ্ছে, কাউকেই দায়ী করতে পারছি না।"

গাড়ি পার হয়ে গেল বিড়লা তারামণ্ডল। চিরকুটটা এখন ঝিনুকের হাতে। আজকের চিঠিটায় সেই অর্থে হুমকি দেওয়া হয়নি। অক্ষরগুলো থেকে ফুটে বের হচ্ছে অপরাধীর স্পর্ধা। দীপকাকুর মুখ দেখে বোঝা যাচ্ছে, ভীষণ অশান্ত হয়ে আছে মন। এই চিঠিটা একটু হলেও দীপকাকুর আত্মবিশ্বাসে চিড় ধরিয়েছে। পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে ঝিনুক বলে, "ক্যাচলাইনটা কিন্তু ভালই, 'এই আরামের যোগ্য আপনার পা'। সত্যি, মানুষের পায়ের খাটুনি সবচেয়ে বেশি।"

চলন্ত গাড়ির জানলার বাইরে তাকিয়ে দীপকাকু বলেন, "আমি এই কেসের যোগ্য কিনা, প্রমাণ দিতে হবে এবার, যদি কেসটা সল্‌ভ করতে পারি, গোয়েন্দাজীবনের স্মরণীয় ঘটনা হয়ে থাকবে।"

॥ ৭ ॥

দীপকাকু বোধ হয় হার মেনে নিলেন। সপ্তাহ ঘুরে গেল, কোনও সাড়াশব্দ নেই। ফোন করলে হয় তুলছেন না, নয়তো কেটে দিচ্ছেন লাইন। ঝিনুক যখন ধরেই নিয়েছে, দীপকাকু তো অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী নন, বুদ্ধিমান মানুষের মধ্যে একজন। প্রত্যেক মানুষের জীবনেই হার-জিত আছে। হাল ছেড়ে দেওয়া ভাবটা হোঁচট খায় আজ সকালের খবরের কাগজ দেখে। জুতোর বিজ্ঞাপনটা বেরিয়েছে। প্রস্তুতকারক রোডস্টার কোম্পানি নয়। এই কোম্পানিটার নাম 'নেক্সট স্টেপ'। অ্যাডটা তৈরি করেছে রূপরেখা এজেন্সি। তার মানে আবার চুরি! কী করলেন তা হলে দীপকাকু! দায়িত্ব নিয়েছিলেন, রোডস্টার কোম্পানিকে পছন্দ করানো থেকে প্রচার অবধি দেখাশোনা করবেন। ওঁর হেফাজত থেকেও চুরি হয়ে গেল! ফোটোর আইডিয়াটা এক, জুতোর মধ্যে বিড়াল বসে আড়মোড়া ভাঙছে। কিন্তু ঝিনুক যে চারটে ফোটো দেখেছিল, তার কোনওটাই এটা নয়। সুজয়বাবুর ক্যাপশনটা একেবারে হুবহু টুকে দিয়েছে, 'আপনার পা জোড়া/ দেবে শুধু আড়মোড়া।'

বিজ্ঞাপনে অগুনতিবার চোখ বুলিয়ে ঝিনুক উঠে যায় দীপকাকুকে ফোন করতে। আশ্চর্য ব্যাপার, একবার ডায়াল করতেই পাওয়া গেল। দীপকাকু বললেন, "আর কিছুক্ষণ পর আমিই তোমাকে ফোন করতাম। রেডি হয়ে নাও। তোমাকে নিয়ে সুজয়বাবুর বাড়ি যাব।"

"সকালের কাগজটা দেখেছেন?" ফোনের এপার থেকে জিজ্ঞেস করে ঝিনুক।

ও-প্রান্ত থেকে দীপকাকু বলেন, "দেখেছি।"

দীপকাকুর গলায় কোনও উদ্বেগ ধরা পড়ল না। ঝিনুক বলে, "কী বুঝলেন?"

"সুজয়বাবুর বাড়িতে গিয়ে সব বলব। তার আগে কোনও প্রশ্ন করবে না।" লাইন কেটে দিলেন দীপকাকু।

যোধপুর পার্কে সুজয়বাবুর ফ্ল্যাটে আজ প্রথম এল ঝিনুক। দীপকাকু আগে একদিন এসেছিলেন জিজ্ঞাসাবাদের জন্য। বেল টিপতে দরজা খুললেন স্বয়ং সুজয় ঘোষ। দীপকাকুকে দেখে বললেন, "কাগজ দেখেছি। আলোচনাটা অফিসে বসে সবাই মিলে করলে হত না?"

ঝিনুক বুঝতেই পারে, এখানে আসার আগে দীপকাকু ফোন করে দিয়েছিলেন সুজয়বাবুকে। ঘরে ঢুকে এসে দীপকাকু বলেন, "না। আমার মনে হয়েছে এই চুরির ঘটনাটায় আপনার সঙ্গে প্রথমে কথা বলা উচিত।"

সুজয়বাবু আর না করতে পারলেন না। নিমরাজি ভঙ্গিতে বললেন, "আসুন তা হলে।"

ড্রয়িং স্পেসটা কাঠের পার্টিশান দিয়ে ঘেরা। দীপকাকু, ঝিনুক বসার পর সুজয়বাবু বসলেন মুখোমুখি লম্বা সোফাটায়। দীপকাকু বলেন, "আপনার ফ্ল্যাটে এই মুহূর্তে কে কে আছেন?"

"কেন বলুন তো?" কপালে ভাঁজ ফেলে জানতে চান সুজয়বাবু।

"এখন যে কথাগুলো আপনাকে বলব, খুবই পার্সোনাল। আমরা তিনজন ছাড়া অন্য কেউ সেটা জানুক, আমি চাই না।"

একটু ভেবে নিয়ে সুজয়বাবু বললেন, "বাড়িতে এখন আমি, আমার স্ত্রী, মেয়ে, আর কাজের লোক। ছেলে সকালে অফিসে বেরিয়ে গিয়েছে।"

"আমাদের কথা চলাকালীন তারা যেন কেউ না আসে, ব্যবস্থা করতে পারবেন?"

সুজয়বাবু সোফা ছেড়ে ওঠেন। মুখে চিন্তার প্রলেপ। বলেন, "দাঁড়ান, ওদের বলে আসি। চা হয়ে গেলে যেন আমাকে ডেকে দেয়।"

সুজয়বাবু চলে গেলেন পার্টিশানের ওপারে। ঝিনুকের কৌতূহল মাত্রা ছাড়াচ্ছে। কী এমন কথা বলতে এসেছেন দীপকাকু? যার জন্য এত গোপনীয়তা দরকার? বাড়ি থেকে বেরনোর আগে দীপকাকুর মতিগতি বোঝার জন্য ঝিনুক বলেছিল, "রূপরেখা এজেন্সির সঙ্গে অপরাধীর যোগাযোগ বেশি। রূপরেখাকে নিয়ে নতুন করে তদন্ত শুরু করলে হয় না?"

শর্ত অনুসারে দীপকাকু কোনও উত্তর দেননি। যা বলার এখন বলবেন।

সুজয়বাবু ফিরে এসে বসলেন সোফায়, "বলুন, আপনার পার্সোনাল কথা।"

বেশ খানিকটা সময় ধরে দীপকাকু তাকিয়ে আছেন সুজয়বাবুর দিকে। ব্যাপারটা অস্বস্তিকর। হঠাৎ বলে ওঠেন, "আপনাদের অ্যাড প্ল্যান কোথা থেকে ফাঁস হচ্ছে, বের করে ফেলেছি।"

"ওঃ, রিয়েলি?" বিস্মিত কণ্ঠে বলেন সুজয়বাবু। ঝিনুক তো হতবাক। সত্যি, দীপকাকু একখানা মানুষ বটে! কীরকম কথা চেপে রাখতে পারেন। এত বড় সাফল্যে অদ্ভুত নির্বিকার!

দীপকাকু বলতে শুরু করেছেন, "আপনাদের কেসটা খুবই কঠিন ছিল। বেশ কিছুদিন কোনও নাগাল পাচ্ছিলাম না আমি। তখনই ঠিক করি অপরাধীর ছায়া অনুসরণ করে লাভ নেই। বরং এমন একটা ফাঁদ তৈরি করা যাক, কালপ্রিট নিজে সেখানে এসে ধরা দেবে।"

"ধরা কি দিয়েছে?" জানতে চান সুজয়বাবু।

boierpathshala.blogspot.com

দীপকাকু বলেন, "হ্যাঁ, দিয়েছে। আজ সকালের নিউজপেপারে।"

উত্তেজনায় দম বন্ধ করে বসে আছে ঝিনুক। এক্ষুনি ঘোষিত হবে অপরাধীর নাম। সুজয়বাবুর চেহারায় পড়েছে বিপুল টেনশনের ছাপ। দম নিয়ে দীপকাকু বলেন, "আমার ফাঁদটা ছিল এরকম, জুতোর বিজ্ঞাপনের তিনটে ক্যাপশন আপনাদের তিনজনের কাছে নিয়েছিলাম। কথামতো রোডস্টার কোম্পানির সঙ্গে দেখা করিনি। দিনপাঁচেক পর আপনার কাছে এসে মিথ্যে বলেছিলাম, আপনার ক্যাপশনটাই পার্টির পছন্দ হয়েছে। তবে এ নিয়ে এখন আলোচনার দরকার নেই। আপনারা যেমন এই অ্যাডের ব্যাপারটা ভুলে আছেন, থাকুন। বিজ্ঞাপনটা নির্বিঘ্নে প্রচার হোক। তারপর একসঙ্গে বসা যাবে। কি, বলেছিলাম কিনা?"

ঘাড় হেলান সুজয়বাবু। দৃষ্টিতে দীপকাকুকে বুঝতে না পারার অসহায়তা। ফের শুরু করেন দীপকাকু, "ঠিক একই রকমভাবে আমি পার্থবাবু, গৌতমবাবুর সঙ্গে আলাদা দেখা করেছি, বলেছি, তাঁদের ক্যাপশনটা সিলেক্ট করেছে পার্টি। বাকি আপনাকে যা বলেছি, ওঁদেরও তাই। অর্থাৎ, আপনারা তিনজনই জানলেন, নিজের দেওয়া ক্যাপশনটা সিলেক্টেড। আমি কৃতজ্ঞ, আপনারা রোডস্টার কোম্পানির সঙ্গে এই নিয়ে আর কোনও কথা বলেননি। আমার নির্দেশমতো বিজ্ঞাপনটা ভুলেছিলেন। আমি অপেক্ষা করছিলাম, অ্যাড প্ল্যানটা চুরি হওয়ার। আপনাদের মধ্যে যিনি অপরাধী, পাচার করবেন নিজের ক্যাপশনটাই। কেননা, তিনি জানেন তাঁর স্লোগানটাই পছন্দ করেছে পার্টি। আজ সকালে দেখা গেল আপনার দেওয়া ক্যাপশন চুরি হওয়া বিজ্ঞাপনে বেরিয়েছে। অর্থাৎ..."

কথা আটকে গেল দীপকাকুর। সুজয়বাবু ঢলে পড়েছেন সোফায়। "সর্বনাশ করেছে!" বলে দীপকাকু উঠে গেলেন সুজয়বাবুর কাছে। ঝিনুকের মনে হচ্ছে অ্যাক্টিং। ধরা পড়ে গিয়ে অভিনয় করছেন সুজয়বাবু। উনি যে পাকা অভিনেতা, এ-ব্যাপারে এখন আর কোনও সংশয় নেই। ঝিনুক এতটুকু আঁচ করতে পারেনি, সুজয়বাবুই অপরাধী। বরং পার্থবাবু, গৌতমবাবুকেই সে সন্দেহের তালিকায় রেখেছিল।

সুজয়বাবুর রিস্ট ধরে পাল্‌স দেখছেন দীপকাকু। মেলাচ্ছেন নিজের ঘড়ির সঙ্গে। মুখে উদ্বেগের সঙ্গে জিজ্ঞাসাও জমা হচ্ছে। সুজয়বাবুর হাত সোফায় নামিয়ে রেখে দীপকাকু ডেকে ওঠেন, "মিসেস ঘোষ! মিসেস ঘোষ! প্লিজ, একবার আসবেন!"

দীপকাকুর ডাকে প্রবল উৎকণ্ঠা মিশে ছিল। এক মহিলা ছুটতে-ছুটতে তড়িঘড়ি ঘরে এসে দাঁড়ালেন, "কী হয়েছে?"

দীপকাকুকে উত্তর দিতে হল না। মহিলার চোখে পড়েছে স্বামীর অচেতন লুটিয়ে থাকা। প্রায় আর্তনাদ করে ওঠেন, "মিঠু! ও মিঠু! দেখে যা তোর বাবার..."

স্লিপিং গাউন, হাই পাওয়ারের চশমা পরা মিঠু দৌড়ে আসে। মা, মেয়ে দু'জনেই পৌঁছে যান সুজয়বাবুর মুখের সামনে।

ঝিনুকের এবার বেশ নার্ভাস লাগছে। দীপকাকুরও অপ্রতিভ অবস্থা। মিঠু আচমকাই ঘুরে তাকায় ঝিনুকদের দিকে। চাউনিতে রাগ গনগন করছে। চাপা হিসহিসে কণ্ঠে জানতে চায়, "কী হয়েছে বাবার? আপনারা কারা?"

দীপকাকু সঙ্গে-সঙ্গে নিজের কার্ড বের করে মিঠুর হাতে দেন। বলেন, "ওঁর পাল্‌সরেট একদম ঠিক আছে। সেটা বোধ হয় পেসমেকার বসানো আছে বলে। তাও কেন..." কথা অসম্পূর্ণ রেখে দীপকাকু অন্য প্রসঙ্গে যান, "কলকাতার সবচেয়ে নামী নার্সিং হোমের এক ডাক্তার আমার বন্ধু। আমি ওকে অ্যাম্বুলেন্স পাঠাতে বলছি।"

দীপকাকুর কার্ড দেখে একটু দমেছে মিঠু। বলে, "বাবার পেসমেকার লাগানো আছে, আপনারা জানেন?"

কথাটা যেন শুনতেই পেলেন না দীপকাকু, সেলফোন বের করে নম্বর টিপতে শুরু করেছেন। পাওয়া গেল বন্ধুকে। এখানকার পরিস্থিতি, ঠিকানা জানিয়ে তাড়াতাড়ি অ্যাম্বুলেন্স পাঠাতে বললেন। ফোনসেট পকেটে রেখে মিঠুকে নির্দেশ দিলেন, ঠান্ডা জল নিয়ে আসতে। মিঠু জানতে চাইল, "আপাতত কোনও ওষুধ দিতে হবে কিনা কিছু বললেন আপনার বন্ধু?"

"না, এখন কিছু দিতে হবে না।" বলে দীপকাকু এগিয়ে গেলেন সুজয়বাবুর কাছে। ঝিনুকও গেল। দু'জনে মিলে সুজয়বাবুকে সোজা করে শোয়ানো হল সোফায়। সুজয়বাবুর স্ত্রীকে আশ্বাস দিয়ে যাচ্ছেন দীপকাকু, "ঘাবড়ে যাবেন না। নিজেকে শক্ত রাখুন। উনি খুব একটা খারাপ নেই। এটা অত্যন্ত সাময়িক ব্যাপার। তা ছাড়া অ্যাম্বুলেন্স তো আসছেই। আমার বন্ধু হার্ট স্পেশ্যালিস্ট..."

ইতিমধ্যে বোতলে ঠান্ডা জল নিয়ে এসেছে মিঠু। ছোটোনো হচ্ছে সুজয়বাবুর মুখে। চোখ কুঁচকে রেসপন্স করছেন। মিঠু, মিঠুর মা দু'জনেই সুজয়বাবুকে ডাকছেন। উঃ, আঃ শব্দে সাড়াও দিচ্ছেন সুজয় ঘোষ।

ফ্যান চলছে ফুল স্পিডে। ঝিনুক বলে, "কোনও টেবিল ফ্যান নেই? আরও যদি হাওয়া দেওয়া যেত..."

"বাবার লিভিংরুমে এসি লাগানো। নিয়ে যাব ধরাধরি করে?" মিঠু অনুমতি চায় দীপকাকুর কাছে।

এমন সময় ডোরবেল বেজে ওঠে। ঝিনুক অবাক হয়, "এত তাড়াতাড়ি এসে গেল অ্যাম্বুলেন্স!"

বাইরে একটি মানুষের গলা। কথা বলছেন কাজের লোকের সঙ্গে। মানুষটি ঘরে আসেন। ঝিনুক অবাক হয়, ডাঃ অজিত রায়। সুজয়বাবুর বন্ধু।

ডাঃ রায় ঘরে ঢুকতেই মিঠু বলে ওঠে, "ডাক্তারকাকু দ্যাখো, বাবার কী হয়েছে!"

ঝিনুকদের লক্ষ করার অবকাশ ডাঃ রায়ের নেই। সুজয়বাবুর দিকে হেঁটে যেতে-যেতে বলছেন, "আমি সুজয়ের কাছে এসেছি একটা কাজে। তোমাদের কাজের লোক দরজা খুলে বলল, এই ঘটনা।"

স্টেথোস্কোপ ঝুলছিল গলায়, নামিয়ে পরীক্ষা করছেন বন্ধুকে। এই অবস্থাতেই মিঠুর কাছে জানতে চান, "অল অফ আ সাডেন এরকম হয়ে গেল। এনি শক?"

মিঠু চোখের ইশারায় দীপকাকুকে দেখায়। দৃষ্টি অনুসরণ করে ডাঃ রায় দ্যাখেন দীপকাকুকে। বলেন, "ও, আপনি! আপনাদের সেই কেস। কেন ওই সব নিয়ে আলোচনা করেন সুজয়ের সঙ্গে! বেচারার হার্টের অসুখ। আলোচনা যদি করারই থাকে, ওর দুই বন্ধুকে সঙ্গে রেখে করুন।"

দীপকাকু মাথা নিচু করে নিয়েছেন। প্রাথমিক পরীক্ষা সাঙ্গ করে ডাক্তারবাবু বলেন, "আপাতত দিনদু'য়েক আমার নার্সিং হোমে রাখি। মনে হচ্ছে মেজর কিছু নয়। দু'-একটা টেস্টফেস্ট করে ছেড়ে দেব।"

দীপকাকু বলেন, "আমি যে রেমিশন নার্সিং হোমের অ্যাম্বুলেন্স আনতে বলে দিলাম। হয়তো এক্ষুনি এসে পড়বে!"

আচমকা খেপে গেলেন ডাঃ রায়। বললেন, "কে আপনাকে রেমিশনের সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলেছে?"

"কেউ বলেনি। ওঁকে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে যেতে দেখে আমিই করলাম। আমার এক ডাক্তার বন্ধু..."

কথার মাঝখানে ধমকে ওঠেন ডাঃ রায়, "রাখুন আপনার ডাক্তার বন্ধু! সুজয়ের পেসমেকার আমি বসিয়েছি, আমাকে প্রথমে ডাকা উচিত ছিল আপনার। ভাগ্যিস এসে পড়লাম!"

দীপকাকু চুপ করে গেলেন। ডাঃ রায় এবার মিঠুকে বললেন, "আমার গাড়িতেই সুজয়কে নার্সিং হোমে নিয়ে যাচ্ছি। তোমাদের কোনও আপত্তি নেই তো?"

"না না, আপত্তি কেন থাকবে? আপনি যেমন ভাল বুঝবেন...।" বললেন সুজয়বাবুর স্ত্রী।

দীপকাকু ফের বলে ওঠেন, "স্ট্রেচার থাকলে ভাল হত না। এই কন্ডিশনে পেশেন্টকে ধরাধরি করে নিয়ে যাওয়া, মানে আমরা তো তেমন ট্রেন্ড নই!"

"আপনাকে তো ধরতে হবে না। গাড়িতে আমার নার্সিং হোমের দু'জন স্টাফ আছে। আমি ডেকে নিচ্ছি তাদের।" বলে ডাক্তারবাবু

boierpathshala.blogspot.com

নিজের সেলফোন বের করলেন। ঝিনুক লক্ষ করল, দীপকাকু ঘরের কোণের দিকে গিয়ে মোবাইল ফোন বের করে সুইচ টিপতে লাগলেন। ডাঃ রায় স্টাফ দু'জনকে উঠে আসতে বললেন চারতলার এই ফ্ল্যাটে। দীপকাকু বন্ধুকে অ্যাম্বুলেন্স ফিরিয়ে নিতে বললেন।

এর আগে কোনও কেসে নিজেদের এত অবাঞ্ছিত মনে হয়নি। ডাঃ রায়ের রিপোজ অন নার্সিং হোমের কোর্টইয়ার্ডে ঘুরঘুর করছেন ঝিনুক, দীপকাকু। সুজয়বাবু অ্যাডমিটও হয়েছেন। রাখা হয়েছে ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটে। জ্ঞান পুরোপুরি ফেরেনি।

সুজয়বাবুকে যখন আই সি ইউতে নিয়ে যাওয়া হল, খটকা লেগেছিল ঝিনুকের, দীপকাকুকে জিজ্ঞেস করে, "ডাঃ রায় যে বললেন মেজর কিছু নয়, তা হলে কেন ভেন্টিলেশনে রাখা হচ্ছে?"

দীপকাকু বলেছিলেন, "এই ধরনের হার্ট পেশেন্টকে প্রথমে আই সি ইউতে নিয়ে যাওয়া হয়। চব্বিশ ঘন্টা অবজার্ভ করার পর কাল হয়তো জেনারেল বেডে দেবে।"

ঝিনুকের ভয় কাটেনি। খালি মনে হচ্ছে, ডাঃ রায় রোগীর বাড়ির লোকেদের সান্ত্বনা দিয়েছেন। অবস্থা আসলে খুবই জটিল। যদি খারাপ কিছু হয়ে যায় সুজয়বাবুর, দীপকাকুকে দায়ী করবে সুজয়বাবুর আত্মীয়স্বজন। মুখে না বললেও দীপকাকু ভালমতোই সেটা টের পাচ্ছেন। তাই এত অন্যমনস্ক, ঝিনুকের পাশে থেকেও যেন নেই। এরই মধ্যে দীপকাকুর একটা নতুন উপসর্গ লক্ষ করেছে ঝিনুক, কখনও-সখনও নিজের মনে বিড়বিড় করে কথা বলছেন। ঝিনুকের একবার মনে হয়েছিল বাবার কথা, ডেকে পাঠালে কেমন হয়। প্রস্তাবটা তক্ষুনি নাকচ করেছেন দীপকাকু। বলেছেন, "খামোকা ওঁকে ব্যস্ত করে লাভ নেই। কাজের ক্ষতি হবে রজতদার।"

তারপর থেকে ঝিনুক আর কোনও কথা বলেনি। দীপকাকুর পাশে-পাশে হেঁটে বেড়াচ্ছে। পার্থবাবু, গৌতমবাবু খবর পেয়ে চলে এসেছেন নার্সিং হোমে। সুজয়বাবুর ছেলেও এসেছেন। বাড়ির লোক ছাড়াও সুজয়বাবুর আত্মীয়স্বজন জড়ো হচ্ছেন। কেউ কোনও কথা বলছেন না ঝিনুকদের সঙ্গে। সবাই একরাশ উৎকণ্ঠা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন ভিজিটর্স জোনে। ঝিনুকরাই শুধু বাইরে। দীপকাকু এক ফাঁকে নার্সদের সঙ্গে কথা বলেছেন।

পার্থবাবুকে দেখা গেল স্বজনদের জটলার ভিতর থেকে বেরিয়ে আসতে। ঝিনুক প্রমাদ গোনে। সুজয়বাবুর অসুস্থতার কারণ হিসেবে পার্থবাবু নিশ্চয়ই দীপকাকুকেই দুষবেন। তবে খুব বেশি কিছু বলতে পারবেন বলে মনে হয় না। এলোমেলো চুল, থমথমে মুখ, মোটা কাচের ঘোলাটে চশমায় দীপকাকু যেন বিষণ্ণতার প্রতিমূর্তি।

পার্থবাবু সামনে এসে দাঁড়ালেন। একটু সময় নিয়ে ঠান্ডা গলায় জানতে চাইলেন, "সুজয়ের সঙ্গে আলাদা কী দরকার পড়ল আপনার?"

"কেসটার ব্যাপারেই কথা বলতে গিয়েছিলাম।" বললেন দীপকাকু।

"কী কথা?"

সরাসরি উত্তর না দিয়ে দীপকাকু অন্য প্রশ্নে গেলেন, "জুতোর অ্যাডটা দেখেছেন কাগজে?"

"দেখেছি। একটা জিনিস আশ্চর্য লাগছে। আপনি বলেছিলেন আমার ক্যাপশন 'বেডরুম কমফোর্ট' পার্টি পছন্দ করেছে। সুজয়ের স্লোগান চুরি হল কেন তা হলে?"

"চোরেদের সুজয়বাবুর ক্যাপশনটাই পছন্দ হয়েছে।" উত্তর দিলেন দীপকাকু।

পার্থবাবু আর কোনও প্রশ্ন করলেন না। অন্যমনস্কভাবে তাকিয়ে আছেন নার্সিং হোমের দিকে। এক সময় বললেন, "চলুন, চা খাওয়া যাক। বিজনেস, কেস এসব নিয়ে পরে ভাবলেও চলবে। আগে সুজয় ভাল হয়ে ফিরুক।"

"আমি একটু আগেই চা খেলাম। আপনি খেয়ে আসুন।" বললেন দীপকাকু। সম্পূর্ণ মিথ্যে কথা! এড়িয়ে গেলেন পার্থবাবুকে।

পার্থ বর্মন একাই হেঁটে যাচ্ছেন গেটের দিকে। দীপকাকু ঝিনুককে বললেন, "চলো, আমরা একবার বাড়ির চারপাশটা ঘুরে দেখি। আগের দিন সামনের দিকটাই দেখা হয়েছে শুধু।"

পাঁচিলের বাইরে না গিয়ে বাড়ির চৌহদ্দি ধরে হাঁটতে লাগল ঝিনুকরা। বিল্ডিং এরিয়া এতটাই বড়, রাউন্ড কমপ্লিট করতে মিনিটপাঁচেক লেগে যাবে মনে হয়। বাড়ির সামনের দিক এক পাড়ায়, পিছন দিক আর-এক পাড়ায়।

একটা জিজ্ঞাসা অনেকক্ষণ ধরে মাথায় ঘুরঘুর করছে। এই অবসরে প্রশ্নটা করে ফ্যালে ঝিনুক, "আমি একটা ব্যাপার বুঝতে পারছি না, প্রমাণ যখন হয়েই গিয়েছে, সুজয়বাবুর থেকে ফাঁস হচ্ছে অ্যাড প্ল্যান, আপনি কেন বাকি দু'ই পার্টনারকে সে কথা জানাচ্ছেন না?"

মাথা নিচু করে হাঁটতে-হাঁটতে দীপকাকু বলেন, "সেই একটাই পয়েন্ট, মোটিভ। আমি এখনও উদ্দেশ্যটা খুঁজে পাইনি। কেন সুজয়বাবু এই কাজটা করছেন, কী স্বার্থ আছে তাঁর?"

"হয়তো রিভেঞ্জ। দুই পার্টনারের উপর রাগ জমা রয়েছে কোনও কারণে।" বলে ঝিনুক।

"নিজের ক্ষতি করে প্রতিশোধ বড় একটা কেউ নেয় না। তা ছাড়া অনেক অনুসন্ধান করেও এমন কোনও ঘটনা-সূত্র আমি পাইনি, যেখানে সুজয় ঘোষ নিজেদের কোম্পানির শত্রু হয়ে উঠতে পারেন।" একটু থামলেন দীপকাকু। পরে বলেন, "একটা জিনিস মনে রাখবে, জল ছাড়া যেমন মাছ হয় না, উদ্দেশ্য ছাড়া অপরাধ সংঘঠিত হওয়া অসম্ভব। আমি সেই কারণটা জানতেই প্রথম গিয়েছিলাম সুজয়বাবুর কাছে। ওঁকে দোষী শাব্যস্ত করার পর, চাপের মুখে যদি উদ্দেশ্যটা বলে ফ্যালেন। কিন্তু তার আগেই..."

কথা শেষ না করে ধীর লয়ে হেঁটে যাচ্ছেন দীপকাকু। ঝিনুক ভাবে, সুজয়বাবুর যদি খারাপ কিছু হয়ে যায়। তাদের কেসটাও অসম্পূর্ণ রয়ে যাবে। খুবই ইন্টারেস্টিং ছিল এবারের কেস।

দীপকাকু বলে ওঠেন, "উনি অসুস্থ হয়ে অবশ্য আমার একটা সুবিধে করে দিয়েছেন।"

"কী সুবিধে?" জিজ্ঞেস করে ঝিনুক।

উত্তরে দীপকাকু একদম নিজস্ব মিচকে হাসিটা হাসেন। ঝিনুক জানে, ওই হাসিটার আড়ালে দীপকাকু লুকিয়ে রেখেছেন রহস্যভেদের অব্যর্থ নিশানা।

হাঁটতে-হাঁটতে বাড়ির পিছনে এসে থমকে দাঁড়াতে হয় ঝিনুকদের। চিত্রা অ্যাড এজেন্সির বোর্ড! তার মানে একই বাড়িতে নার্সিং হোম, বিজ্ঞাপন কোম্পানি এবং কবাবাস। পুরো বাড়িটাই যথাযথ ব্যবহার হচ্ছে।

সামনের অংশের সঙ্গে এদিকটার কোনও মিল নেই। গেট অবধি মোরাম বিছানো রাস্তা ছাড়া পুরোটাই বাগান। পুরনো গাছপালায় জায়গাটা বেশ নির্জন, ছায়াঘেরা।

ঝিনুকের মতো দীপকাকুও চারপাশে চোখ বোলাচ্ছেন। রিস্টওয়াচ দেখে নিয়ে বললেন, "চলো, দশটা তো বাজতে চলল। চিত্রার মালকিন অফিসে ঢুকেছেন কিনা দেখি। ওঁর সঙ্গে একটু আলাপ করে আসি।"

অফিস স্টাফরা এখনও কেউ আসেনি। পুরো হল ফাঁকা। একটা লোক টেবিল-চেয়ার ঝাড়পোঁছ করছিল। তাকে জিজ্ঞেস করতে জানা গেল, ম্যাডাম উপর থেকে নামবেন একটু পরেই। লোকটা ঝিনুকদের ম্যাডামের চেম্বারেই বসতে বলল। বোঝাই যাচ্ছে, এখানকার সিকিউরিটি নিয়ে তেমন কড়াকড়ি নেই।

এম ডি-র ঘরে ঢুকতেই ঝিনুকের দৃষ্টি কেড়ে নিল একটা পোস্টার। চকোলেটের বিজ্ঞাপন। বাচ্চা মডেলটি ঝিনুকের ভীষণ চেনা। খুবই উত্তেজিত হয়ে ঝিনুক দীপকাকুকে বলে, "ছেলেটাকে চিনতে পারছেন?"

চেয়ারে বসে দীপকাকু বলেন, "পেরেছি। ডাঃ রায়ের প্রয়াত সন্তান।"

"ছেলেটা যে মডেলিং করেছে, ডাঃ রায় তো বলেননি আগের দিন।"

boierpathshala.blogspot.com

"এ আর বলার কী আছে? মায়ের এজেন্সিতে ছেলে মডেল হবে, অত্যন্ত স্বাভাবিক ঘটনা। বিশেষ করে ছেলেটিকে যখন এত সুন্দর দেখতে ছিল!"

দীপকাকুর কথা শেষ হতে না-হতে ঘরে ঢোকেন স্নানস্নিগ্ধ এক মহিলা। বলেন, "আপনারা দেখা করতে এসেছেন আমার সঙ্গে? বলুন কী ব্যাপার?"

ভদ্রমহিলার উপস্থিতিতে ঘরে একটা মিষ্টি গন্ধ ছড়িয়ে পড়েছে। নিশ্চয়ই বিদেশি পারফিউম। নিজের সিটে গিয়ে বসলেন। দীপকাকু যথারীতি নিজের কার্ড বের করে মহিলার হাতে দেন। বলেন, "একটা রুটিন এনকোয়ারির জন্য আপনার কাছে আসতে হল।"

কার্ডটা পড়ে টেবিলের কাচের তলায় রাখলেন চিত্রাদেবী। নামটা ঝিনুক জেনেছে তদন্তসূত্রে। ডাঃ রায় স্ত্রীর নামে এজেন্সি খোলেন। চোখ তুলে ভ্রূ কুঁচকে চিত্রাদেবী জিজ্ঞেস করেন, "আমার কাছে কীসের এনকোয়ারি?"

সংক্ষিপ্ত আকারে অ্যারোর কেসটা বলতে থাকলেন দীপকাকু। জানাতে ভুললেন না, চিত্রা এজেন্সি একবার অজান্তে অ্যারোর অ্যাড হাতিয়েছিল। সুজয় ঘোষ অসুস্থ হয়ে চিত্রাদেবীদের নার্সিং হোমে ভর্তি আছেন, সেটাও বললেন। চেপে গেলেন অসুস্থ হওয়ার আসল কারণ।

সব শুনে চিত্রাদেবী বললেন, "রিয়েলি স্যাড! আমি এইমাত্র সুজয়দাকে দেখে, বাড়ির লোকের সঙ্গে কথা বলে, অফিসে ঢুকলাম! একে হার্টের অসুখ, তার উপর বিজনেস নিয়ে এত ঝড়ঝাপটা... কিন্তু এ সবের জন্য আমরা আর কতটা দায়ী বলুন? একবারই অ্যারোর কপি করেছিলাম। আপনিও জানেন, সেটা হয়েছিল আমাদের অজ্ঞাতে।"

কথার পিঠে দীপকাকু বলেন, "এবার একটু অন্য প্রসঙ্গে যাচ্ছি। আপনার পিছনের দেওয়ালে যে অ্যাড কপিটা লাগানো আছে, মডেল সম্ভবত আপনার ছেলে?"

"হ্যাঁ, ঠিক ধরেছেন। কী করে বুঝলেন."

"এই কেসের সূত্রে আমরা একবার ডাঃ রায়ের সঙ্গে দেখা করি..."

বাকিটুকু বলে দেন চিত্রাদেবী. "ওঁর চেম্বারে সানির ফোটো দ্যাখেন। এটা আমারই আন্দাজ করা উচিত ছিল। কেননা, আমার মিস্টার আপনাদের আগমনের খবর আমাকে জানিয়েছিলেন।"

"আপনার ছেলের ভাল নাম?" এই ফাঁকে জিজ্ঞেস করে নেয় ঝিনুক।

"সায়ন্তন। সায়ন্তন রায়।" শেষ উচ্চারণে গলা ভারী হয়ে আসে চিত্রাদেবীর। দীপকাকু নিরাসক্ত কণ্ঠে পরের প্রশ্নে যান, "এই কেসের তদন্তে নেমে যতটুকু জেনেছি, ছেলের মৃত্যুর পর এজেন্সিটা খোলা হয়। তার আগে কী করে অ্যাডটা তৈরি হল?"

চিত্রাদেবী ম্লান হাসেন। রিভলভিং চেয়ারের সাহায্যে ফোটোর দিকে ঘুরে গিয়ে বলেন, "এটা অ্যারোর তৈরি করা বিজ্ঞাপন। ফোটো-শুটের একদিন পরেই আমার ছেলে মারা যায়।"

ফের মুখোমুখি হন ঝিনুকদের। বলেন, "এরকম একটা মিসহ্যাপ হয়ে যাওয়ার কারণে সুজয়দারা বিজ্ঞাপনটা মার্কেটে ছাড়েননি। ইনফ্যাক্ট, আমি জানতাম না কাজ এতটা হয়ে গিয়েছিল। ক'দিন আগে আমার হাজব্যান্ড এই ফোটোটা আমাকে দিলেন।"

দীপকাকু কোনও প্রশ্ন করতে যাচ্ছিলেন, দরজায় ঠকঠক শব্দ। চিত্রাদেবী বললেন, "এসো।"

যে লোকটি ঘরে ঢুকে এল, তাকে দেখে ঝিনুকের চক্ষু চড়কগাছ। সেই হ্যান্ডবিলওলা! লোকটাও হতভম্ব হয়ে গিয়েছে ঝিনুকদের দেখে। তাড়াতাড়ি ঘোর কাটিয়ে, চাবি এগিয়ে দেয় চিত্রাদেবীর দিকে। বলে, "গাড়ি রেখে গেলাম ম্যাডাম।"

মালকিনের উত্তরের অপেক্ষায় না থেকে বেরিয়ে যায় লোকটা। দীপকাকু চোখের ইশারায় ঝিনুককে কিছু বলেন। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায় ঝিনুক। চিত্রাদেবীকে বলে, "এক্সকিউজ মি, আমি একটু আসছি।"

বারান্দায় এসে ঝিনুক দ্যাখে, ভোঁ ভা। প্রায় পঁচিশ ফুট মোরাম বিছানো রাস্তার পর গেট। কেউ কোথাও নেই। লোকটা হাওয়ায় মিলিয়ে গেল নাকি!

বারান্দা থেকে নেমে আসে ঝিনুক, দীপকাকু ইশারায় লোকটাকে ফলো করতে বলেছেন। বাগানের চারপাশে চোখ বোলায়, কোনও অস্তিত্ব নেই। উঁচু গাছের ডালে খোঁজে ঝিনুক, যদি উঠে গিয়ে থাকে। পায় না। ফিরতে থাকে অফিসের দিকে।

চৌকাঠ ডিঙোলেও চেম্বারে গেল না ঝিনুক। দরজার আড়াল থেকে লক্ষ রাখল গেটের উপর। এবং যা ভেবেছিল তাই, একটা মোটাসোটা গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল লোকটা। এপাশ-ওপাশ দেখে নিয়ে গুটিগুটি পায়ে এগিয়ে চলল গেটের দিকে।

সময় নষ্ট করা চলবে না। বড়-বড় স্টেপিংয়ে দৌড় শুরু করে ঝিনুক। নুড়ি বিছানো রাস্তায় দৌড় প্রায় হাঁটার শামিল। পায়ের শব্দ পেয়ে লোকটা ঘুরে তাকায়। সে-ও পড়িমড়ি করে ছুটতে থাকে। ঝিনুকের চেয়ে অনেকটাই এগিয়ে আছে। গেটের বাইরে চলে গেলে ওকে আর ধরা যাবে না। সেখানে নুড়ি বিছানো নেই। বাঁ পা সামনে রেখে আপ্রাণ জাম্প দেয় ঝিনুক।

দু'জনেই এখন গেটের বাইরে ফুটপাতে গড়াগড়ি খাচ্ছে। খুব তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ায় ঝিনুক. লোকটা উঠতে যাচ্ছে, ঝিনুক নির্মম একটা কিক ছোড়ে। কী অনায়াসে হাত দিয়ে সেটা আটকে, সোজা হয় লোকটা।

প্রতিপক্ষের হাইট বেশি, ঝিনুক পরের স্ট্রোক নেয় পা দিয়েই। এটাও প্রতিহত হয়। ঝিনুক বুঝতে পারে লোকটা কুংফু জানে। অসম্ভব দ্রুত নাইফ হ্যান্ড স্ট্রোক নেয় ঝিনুক। মুহূর্তে সরে যায় লোকটা। ফ্লেক্সিবিলিটি দারুণ! এ মা, লোকটা হাসছে কেন! ভাবটা এমন, যেন ফ্রেন্ডশিপ কনটেস্ট। ঝিনুক পরের পর স্ট্রোক নিতেই থাকে। প্রতিআক্রমণে না গিয়ে লোকটা শুধু মার আটকায়। লোক জমা হচ্ছে, লোকটার হাসিমুখ দেখে দর্শকবৃন্দ নিশ্চয়ই ভাবছে, কুংফুর টিচার তালিম দিচ্ছেন তাঁর ছাত্রীকে। এক সময় সত্যিই টিপ্‌স দিতে শুরু করে লোকটা, 'ডান পা সামনে রাখো, বাঁ হাতে, বাঁ হাতে নাও স্ট্রোক। এ কী হচ্ছে! হাঁটু ভাঙছে কেন?...' ঝিনুক প্রায় বোর হয়ে যাচ্ছে, কোনও আক্রমণেই কাজ হচ্ছে না। পাবলিক ভুল বুঝে সমানে উৎসাহ জুগিয়ে যাচ্ছে। আচমকা কে যেন লোকটার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। দীপকাকু! হ্যান্ডবিলওলাও হকচকিয়ে গিয়ে ফুটপাতে বসে পড়েছে। দীপকাকু কলার ধরে তুলতে যাবেন, লোকটা বুঝিয়ে দিল, সে কত বড় প্লেয়ার! এক লাথিতে দীপকাকুকে ছিটকে ফেলে দিল প্রায় ফুটপাঁচকে দূরে। উঠে দাঁড়িয়ে লাগাল চোঁ-চা দৌড়।

ঝিনুক ছুটে যায় দীপকাকুর কাছে। যে কিকটা কষিয়েছে লোকটা, কুংফুর ভাষায় ডেথ-কিক। ফুটপাতে শুয়ে ছটফট করছেন দীপকাকু। কপাল কেটে রক্ত বের হচ্ছে, আরও হয়তো কোথাও কেটেছে, ফেটেছে।

ব্লিডিং দেখে নার্ভাস হওয়ার মেয়ে নয় ঝিনুক। দীপকাকুর মাথা তুলে নিয়েছে কোলে। পেটে হাত চেপে দীপকাকু গোঙাচ্ছেন। লাথিটা মারা হয়েছে তলপেটে।

রাস্তায় জমা হওয়া লোকগুলো ঘিরে ধরেছে ঝিনুকদের। এতক্ষণে মালুম হয়েছে, আগের লড়াইটা ফ্রেন্ডশিপ ছিল না।

ভিড়ের মধ্যে থেকে কেউ একজন বলে ওঠে, "চলুন, হসপিটালে নিয়ে যাই।"

ঝিনুক ভাবছে কী করা উচিত, আঘাত কতটা গুরুতর? দীপকাকুর সেলফোন থেকে বাবাকে ফোন করবে কি?

যন্ত্রণারত অবস্থাতেই দীপকাকু নির্দেশ দেন, "ডাঃ রায়ের নার্সিং হোমেই অ্যাডমিট করো আমায়।"

॥ ৮ ॥

সম্ভাব্য অপরাধী, গোয়েন্দা দু'জনেই যদি হাসপাতালের শরণাপন্ন হয়, কেসের আর কী অবশিষ্ট থাকে। উৎসাহ হারিয়ে ঝিনুক কলেজ, কোচিং, ক্যারাটে ক্লাব, কম্পিউটার ক্লাসে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। দেখতে-

boierpathshala.blogspot.com

দেখতে চারটে দিন গড়িয়ে গেল। একটাই সুখবর, ভর্তি হওয়ার পরের দিনই দীপকাকু ছাড়া পেয়েছেন নার্সিং হোম থেকে। আঘাত তেমন মারাত্মক নয়। আপাতত বিশ্রামে আছেন। সুজয়বাবুর অবস্থাও স্টেডি। গত কাল বাড়ি ফিরেছেন। ঝিনুকের যথেষ্ট সন্দেহ ছিল, অ্যারোর কেসটা নতুন উদ্যমে দীপকাকু আদৌ শুরু করবেন কিনা। ধারণা মিথ্যে প্রমাণিত হয়েছে আজ সকালে।

ফোন করেছিলেন দীপকাকু। ঝিনুকই ফোনটা তোলে। দীপকাকু বলেন, "দশটা নাগাদ অ্যারোর অফিসে চলে এসো। ওঁদের কেস সম্পর্কিত কয়েকজনকে ডাকা হয়েছে। আজই ঘোষণা করব অপরাধীর নাম।"

এতটাই অপ্রত্যাশিত এই খবর, ঝিনুকের মুখ দিয়ে বেরিয়ে যায়, "ঠিক আছে, আমি আসছি।"

রিসিভার নামিয়ে দিতে যাবে, দীপকাকু বলেন, " দশটা বাজতে এখনও দু'ঘণ্টা বাকি। ধীরেসুস্থে এসো।"

ফোন রেখে ফিরে আসছিল ঝিনুক। মুখের সামনে থেকে নিউজপেপার সরিয়ে বাবা বলেন, "কী রে, এরকম ভ্যাবলা হয়ে গেলি কেন? কার ফোন?"

সোফায় ধপাস করে বসে পড়ে ঝিনুক। দীপকাকু ফোনে যা বললেন, বাবাকে বলে। তারপর জিজ্ঞেস করে, "আচ্ছা বাবা, তদন্তের তো এখনও অনেকটাই বাকি আছে, এর মাঝে দীপকাকু নার্সিং হোমে গেলেন। এখন চলছে কমপ্লিট রেস্ট। কখন অপরাধীকে শনাক্ত করলেন?"

নিউজপেপার ভাঁজ করতে-করতে বাবা বলেছিলেন, "জাপানে জানিস তো, রিফ্লেশ পার্লার বলে একটা ব্যাপার আছে। মাথার খাটুনি বেশি হয়ে গেলে, সেখানে গিয়ে কয়েক ঘণ্টা কাটিয়ে আসে ওখানকার মানুষ। জট পাকিয়ে যাওয়া চিন্তা ফের ঝরঝরে হয়ে ওঠে। আমাদের পোড়া দেশে সেসবের ব্যবস্থা তো নেই। দীপঙ্কর তাই শেল্টার নিয়েছিল নার্সিং হোমে। আসলে অনেক আগেই অপরাধীকে চিহ্নিত করেছে, প্রয়োজন ছিল প্রখর যুক্তি দিয়ে তাকে উপস্থাপিত করা। সেবা-শুশ্রূষায় শুয়ে থেকে জাল বিস্তার করেছে যুক্তির।"

জাপানের প্রসঙ্গ উঠে পড়েছে দেখে, শুধু "ও" বলে চুপ করে গিয়েছিল ঝিনুক। তবে বাবার কথার মধ্যে একটা সত্যি ছিল, দীপকাকুকে নার্সিং হোমে ভর্তি করার সময় ডাঃ রায় বলেছিলেন, "ইনজুরি সেরকম সিরিয়াস নয়, বিকেলেই ছেড়ে দিতে পারব বলে মনে হচ্ছে।"

ঝিনুকের ফোন পেয়ে বাবা ততক্ষণে চলে এসেছিলেন। যন্ত্রণাকাতর দীপকাকুকে দেখে বলেছিলেন, "একটা-দু'টো রাত রেখেই দিন ডাক্তারবাবু। বাড়িতে নার্সিং করার মতো কেউ নেই। কাজের বৃদ্ধাকে নিয়ে কলকাতায় একাই থাকে। বাবা, মা, আত্মীয়স্বজন থাকেন দেশের বাড়ি মেদিনীপুরে। যা কিছু টেস্টফেস্ট করার করে নিন, খরচ নিয়ে ভাবতে হবে না।"

সিটি স্ক্যান, এক্স রে, সবই হয়েছে। কিছুই পাওয়া যায়নি। নার্সিং হোম থেকে ছাড়া পাওয়ার পর ঝিনুক, বাবা মিলে গাড়ি করে দীপকাকুকে বাড়ি পৌঁছে দিয়েছিলেন। সেখানে গিয়েও শয্যা নিলেন। এই ঘটনায় ঝিনুক একটা জিনিস বুঝে গিয়েছে, দীপকাকু একটু আতুপুতু টাইপের।

"কী রে, কী ভাবছিস এত?" বাবার ডাকে ভাবনায় ছেদ পড়েছিল।

ঝিনুক বলে, "কিছু না।" সোফা ছেড়ে উঠতে যাচ্ছে, বাবা বললেন, "চল, আমিও তোর সঙ্গে যাব। দেখে আসি দীপঙ্করের খেলটা।"

বাবার সঙ্গে গাড়িতে করে ঝিনুক এখন চলেছে অ্যারোর অফিসে। আশুদাই ড্রাইভ করছে। মাথায় ভিড় করে আসছে নানান প্রশ্ন, কে হতে পারে অপরাধী? সুজয়বাবুই যদি হন, এত তাড়াতাড়ি মিটিংটা ডাকা উচিত হয়নি। আর-একটু সুস্থ হতে দেওয়া যেত। অপরাধের মোটিভ কি পাওয়া গেল? চিত্রাদেবীর সঙ্গে কি অপরাধের কোনও যোগ আছে? ছদ্ম হ্যান্ডবিলওলা ওঁরই কাজের লোক। সম্ভবত ড্রাইভার। চাবি দিতে এসেছিল।

বাবা অনেকক্ষণ চুপ করেছিলেন, কেসটা নিয়ে ভাবছিলেন হয়তো। এখন বলে উঠলেন, "দীপঙ্কর কিন্তু রহস্য উপন্যাস থেকে ধার করে শেষ দৃশ্যটা করছে। সমস্ত পাত্রপাত্রীকে ডেকে মিটিং করে, তাদের মধ্যেই অপরাধীকে চিহ্নিত করা, সামলাতে পারলে হয়! রহস্যকাহিনির চরিত্ররা লেখকের ইচ্ছে অনুসারে কথা বলে। বাস্তবের চরিত্র কখন কী আচরণ করবে বোঝা মুশকিল। বিশেষ করে এই কেসের পাত্রপাত্রীরা যথেষ্ট বুদ্ধিমান। অঙ্কের নামে কোনও ধরনের ফ্যালাসি যদি করতে যায় দীপঙ্কর, শিওর ফেঁসে যাবে।"

বুকটা একটু ফাঁকা হয়ে যায় ঝিনুকের। নার্ভাস লাগছে। কে জানে, কী করবেন দীপকাকু। এখনকার অনুভূতির সঙ্গে ঝিনুক হঠাৎই মিল খুঁজে পায় সেই দিনগুলোর। মাধ্যমিক পরীক্ষার সময় রোজ সঙ্গে যেতেন বাবা। এরকমই ভয়-ভয় ভাব নিয়ে গাড়িতে বসে থাকত ঝিনুক।

অ্যারোর অফিসে পৌঁছে গিয়েছে ঝিনুকরা। মিটিং এখনও শুরু হয়নি। ঝিনুকদের অপেক্ষায় ছিলেন দীপকাকু। চেম্বারে আপাতত সাতজন। ঝিনুকরা তিনজন, তিন পার্টনার আর ডাঃ রায়। সবাইকে চা দেওয়া হয়েছে। টেবিলের মাঝখানে দু'টো মিনারেল ওয়াটারের বোতল। ঝিনুক আশা করেছিল এই মিটিংয়ে রূপরেখা, লোটাস, আর্টলাইনের মালিকদের দেখবে। চিত্রাদেবীর কথাও মনে হয়েছিল, ডাঃ রায় কি ওঁর বদলে এসেছেন?

প্রশ্নটা ডাঃ রায় নিজেই তুললেন, "মিঃ বাগচী আমাকে কেন এই মিটিংয়ে ডাকা হয়েছে জানতে পারি কি?"

চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে দীপকাকু বলেন, "আপনাকে ডাকা হয়েছে সুজয়বাবুর স্বাস্থ্যের কারণে। আজ এমন কিছু অপ্রিয় কথা বলব, ওঁর পক্ষে চাপের হয়ে যাবে। সদ্য নার্সিং হোম থেকে বেরিয়েছেন।"

ডাঃ রায় একটু যেন নিশ্চিন্ত হলেন, ঝিনুক লক্ষ করেছে, দীপকাকু সঙ্গে একটা ব্রিফকেস এনেছেন, রাখা আছে ওঁর চেয়ারের পায়ার কাছে।

দীপকাকুকে মেজাজে চা খেয়ে যেতে দেখে অস্থির হচ্ছেন পার্থবাবু। বলেই ফ্যালেন, "নিন, শুরু করুন।"

মুখ তোলেন দীপকাকু। বলেন, "আমি প্রথমেই ধন্যবাদ জানাই অ্যারোর তিন ডিরেক্টরকে। এরকম একটা জটিল কেস ওঁরা ভরসা করে আমার হাতে তুলে দিয়েছেন। এক সময় মনে হয়েছিল, এ-কেস আমার পক্ষে সল্‌ভ করা প্রায় অসম্ভব। অনেক ভেবে আমি একটা প্ল্যান তৈরি করি, অনেকটা অঙ্কের মতো তার ছক।"

দীপকাকু জুতোর বিজ্ঞাপনের প্ল্যানটা বলতে থাকেন। সব শেষে বলেন, "হিসেবমতো প্রমাণিত হয় খবর ফাঁস হচ্ছে সুজয়বাবুর থেকে। সেটা ওঁকে জানাতেই অসুস্থ হয়ে পড়লেন। আমি নিশ্চিত ছিলাম, কোম্পানির গোপন খবর সুজয়বাবুর থেকে ফাঁস হলেও, উনি সেটা করছেন না। কেননা, তদন্ত করে জেনেছি, কোম্পানির ক্ষতি করার কোনও অভিপ্রায় ওঁর ছিল না। ব্যবসাটাকে নিজের চেয়েও বেশি ভালবাসেন। ওঁর উদ্যোগেই কোম্পানিটা খোলা হয়েছিল। এর থেকেই আমি ধরে নিই, সুজয়বাবুর অজ্ঞাতে কেউ ওঁর কাছ থেকে অ্যাড প্ল্যান বের করে নিচ্ছে।"

"সেটা কী করে সম্ভব?" প্রশ্নটা করলেন বাবা। বাকিরা গভীর মনোযোগে দীপকাকুর কথা শুনছেন।

"বলছি।" বলে কাপের তলানিতে চুমুক দিলেন দীপকাকু। ফের শুরু করেন, "সুজয়বাবু অসুস্থ হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে কলকাতার নামী নার্সিং হোমে ভর্তি করার বন্দোবস্ত করেছিলাম। কাকতালীয়ভাবে ফ্ল্যাটে এসে হাজির হন ডাঃ রায়। তাঁর আসাটাকে কোইনসিডেন্ট হিসেবে ধরলেও, সঙ্গে দু'জন নার্সিং হোমের স্টাফ আনাটা আমার কাকতালীয় মনে হয়নি।"

"আপনি ঠিক কী বলতে চাইছেন, বলুন তো?" রীতিমতো চেঁচিয়ে ওঠেন ডাঃ রায়। উত্তরের অপেক্ষায় না থেকে বলেন, "অন্য নার্সিং

boierpathshala.blogspot.com

হোম থেকে একটা অপারেশন সেরে আমি ফিরছিলাম। অপারেশন করতে যাওয়ার সময় দু'জন আসিস্ট্যান্ট আমার সঙ্গেই থাকে।"

হাতের ইশারায় ডাঃ রায়কে থামিয়ে দীপকাকু বলেন, "সুজয়বাবুকে যখন নার্সিং হোমে নিয়ে আসেন, আমি পিছনে ছিলাম। তখনই আপনার স্টাফদের সঙ্গে কথা বলে জানতে পারি, আধঘণ্টা আগে আপনি তাড়াহুড়ো করে দু'জন স্টাফ নিয়ে হঠাৎ বেরিয়ে যান।"

"ওটা আধঘণ্টা নয়, প্রায় একঘণ্টা। আরোগ্য সদনে আমার অপারেশনটা ছিল মিনিট কুড়ির।" যথেষ্ট সপ্রতিভ হয়ে বললেন ডাঃ রায়। কেন জানি ঝিনুকের মনে হল, এটা অজুহাত। সময়ের ফাঁক গলে বেরিয়ে যেতে চাইছেন ডাক্তারবাবু। দীপকাকু বললেন, "আরোগ্য সদনের ব্যাপারটা জানতাম না। ঠিক আছে, এনকোয়ারি করলেই সত্যিটা বেরিয়ে যাবে। যদি না আপনি এখান থেকে বেরিয়েই আরোগ্যর কর্তৃপক্ষকে টাকা খাইয়ে দেন।"

ডাঃ রায় ভীষণ গম্ভীর হয়ে তাকিয়ে আছেন দীপকাকুর দিকে। ভ্রূক্ষেপ না করে দীপকাকু বলতে থাকেন, "রিপোজ অন নার্সিং হোম তথা ডাক্তার অজিত রায়ের বাড়িটা ঘুরে দেখতে গিয়ে আমাদের চোখে পড়ে চিত্রা এজেন্সির বোর্ড। সেখানে ঢুকে আমি প্রথম মোটিভের গন্ধ পাই। চকোলেটের বিজ্ঞাপনের একটা ফোটো টাঙানো ছিল চিত্রাদেবীর চেম্বারে। মডেল ডাঃ রায়ের প্রয়াত সন্তান। অ্যাডটা তৈরি করেছিল অ্যারো কোম্পানি। চিত্রাদেবী বলেন, ক'দিন আগে ডাঃ রায় ওই ফোটোটা তাঁকে দেন। তখনই আমার মাথায় আসে, অ্যারোর সিন্দুক ভাঙার কথা। লকারের খোয়া যাওয়া জিনিসগুলোর যে লিস্ট আমার কাছে ছিল, চকোলেটের বিজ্ঞাপনের ফ্লপি তার মধ্যে একটা।"

আবার তেড়েফুঁড়ে ওঠেন ডাঃ রায়, "এদের লকারের নম্বর আমি কী করে জানব? তা ছাড়া ওই ফ্লপিটা চাইলে কি সুজয়রা আমাকে দিত না? চুরি করতে হবে কেন?"

"দিতেন অবশ্যই। কিন্তু আপনি চাইবেন না। প্রয়াত সন্তানের প্রসঙ্গ এঁদের সামনে তুলতে চান না আপনি। ফ্লপিটা চুরির উদ্দেশ্যে সিন্দুক খোলেননি, উইল হাতানো ছিল উদ্দেশ্য। তিন পার্টনারের মধ্যে ঝগড়া লাগিয়ে দেওয়াই আপনার মূল লক্ষ্য। ফ্লপিটা ঘটনাচক্রে হাতে এসে যায়।"

মৃদু হাসছেন ডাঃ রায়। শ্লেষ মিশিয়ে বলেন, "মিস্টার বাগচী, আপনার অ্যানালিসিসের মধ্যে খানিকটা কল্পনা ঢুকে যাচ্ছে না? লকারের নম্বর জানি না, তবু চুরিটা আমিই করলাম?"

"আপনি নিজের হাতে করেননি, করিয়েছেন। সব একে-একে প্রমাণ করব আমি। আপনি প্লিজ, আমার বক্তব্য শেষ করতে দিন।"

বচসা সামলাতে উদ্যোগ নেন গৌতমবাবু। ডাঃ রায়ের উদ্দেশে বলেন, "দ্যাখ অজিত, তুই যদি নির্দোষ হোস, তা হলে এত রিঅ্যাক্ট করছিস কেন? ওঁকে বলতে দে। বিশ্বাস করা না-করা তো আমাদের ব্যাপার।"

একটু শান্ত হলেন ডাক্তারবাবু। দীপকাকু পূর্ণ উদ্যমে বলতে শুরু করেন, "আমাদের ভাগ্য সুপ্রসন্ন ছিল বলেই, চিত্রাদেবীর সঙ্গে কথা চলাকালীন ঘরে ঢোকে সেই লোক, যে বারবার আমাদের হুমকির চিঠি দিত। আমার ইশারায় ঝিনুক ফলো করতে গেল লোকটাকে। চিত্রাদেবীকে জিজ্ঞেস করলাম লোকটার পরিচয়। উনি বললেন, মাসচারেক হল ডাক্তারবাবু লোকটাকে চিত্রাদেবীর ড্রাইভার হিসেবে নিয়োগ করেছেন। ওই লোকটাকেই ঝিনুক একবার ধরেছিল নার্সিং হোমের সামনে। হ্যান্ডবিল দেওয়ার ছল করে আমার বাইকে হুমকির চিরকুট রাখতে এসেছিল। গার্ড, নার্সরা নতুন কাজের লোককে চিনতে পারেনি। ডাঃ রায়ের বাড়ি এমনিতেই বিশাল এবং তিনটে অংশে ভাগ করা। নার্সিং হোম, লিভিং এরিয়া, চিত্রা এজেন্সি। ডাক্তারবাবুর নির্দেশে লোকটা সামনের অংশে কখনওই যেত না।" একটু থেমে দীপকাকু বলেন, "ফলো করতে গিয়ে ঝিনুক ফিরছে না দেখে আমি বাইরে যাই। চোখে পড়ে সাদা অ্যাম্বাসাডর রাখা আছে পোর্টিকোর নীচে। গাড়ির নম্বর বাংলায় লেখা। ওই গাড়িটা একটু আগে নিয়ে এসেছে ড্রাইভার। চাবি দিতে এসেছিল মালকিনকে। সাদা গাড়িটা চেপে ডাঃ রায় যেতেন গড়িয়ার ফোন বুথে। ওখান থেকে যাবতীয় উড়ো ফোনগুলো করতেন।"

আবার একটা কিছু বলতে যাচ্ছিলেন ডাঃ রায়। দীপকাকু তাঁর দিকে সরাসরি তাকিয়ে বলেন, "বুথ অ্যাটেনডেন্টকে আমি এখনই ডেকে এনে আপনাকে শনাক্ত করাতে পারি।"

ক্রমশ অসহায় হয়ে উঠছে ডাঃ রায়ের চেহারা। বাবা বলেন, "এখনও তো মোটিভটা ক্লিয়ার হল না। ডাক্তারবাবু কেন এসব কাণ্ড করছিলেন?"

"বলছি।" বলে, ফের শুরু করলেন দীপকাকু, "ঝিনুককে খুঁজতে গিয়ে দেখি, ড্রাইভারের সঙ্গে মারামারি করছে। ধরতে যাই লোকটাকে। মার খাই। ভালই লোক জোগাড় করেছেন ডাঃ রায়। ব্যাটা ব্ল্যাকবেল্ট। যাই হোক, আমার আঘাত তেমন গুরুতর না হলেও, আমি ভান করি অসুস্থতার। ঝিনুককে বলি, ডাঃ রায়ের নার্সিং হোমে আমাকে ভর্তি করতে। কারণ, অপরাধী এবং অপরাধের মাধ্যম দু'জনেই আছেন ওখানে। আমাকে বের করতে হবে, কেন তড়িঘড়ি নিজের নার্সিং হোমে সুজয়বাবুকে অ্যাডমিট করলেন ডাক্তারবাবু। চিকিৎসাবিজ্ঞানের হাত ধরেই কি অপরাধটা ঘটছে? ইতিমধ্যে আমি চিত্রাদেবীর সঙ্গে কথা বলে জেনেছি, ছেলের মৃত্যুশোক ডাঃ রায় এখনও কাটিয়ে উঠতে পারেননি। ওঁদের শোওয়ার ঘরে ছেলের একটা বিশাল ফোটো আছে। যার সামনে অনেক রাত অবধি জেগে বসে থাকেন ডাক্তারবাবু। সন্তান জন্মানোর পর থেকেই ডাঃ রায় আদরযত্নের ব্যাপারে ভীষণ বাড়াবাড়ি করতেন। চিত্রাদেবীর চোখে সেটা খানিকটা অস্বাভাবিক ঠেকত। সায়ন্তনের ফুলের মতো চেহারা আর বুদ্ধিদীপ্ত চনমনে ভাব দেখে, অনেক অ্যাড এজেন্সি চাইত মডেল করতে। বিজ্ঞাপন জগৎ সম্বন্ধে চিত্রাদেবীর বরাবরের আগ্রহ ছিল। উনি চাইতেন ছেলে মডেল হোক। ডাঃ রায় অনুমতি দিতেন না। বলতেন, 'সবে তো ক্লাস থ্রি, বড় হতে দাও।'" দম নিতে থামলেন দীপকাকু। এসি ঘরে বসেও তাঁর কপালে বিজবিজ করছে ঘাম। এত কথা গুছিয়ে বলার তো একটা ঝক্কি আছে। ফের শুরু করেন, "ডাঃ রায় তখন কিছুদিনের জন্য বিদেশে। ফরেন টুর ওঁকে হামেশাই করতে হয়। সুজয়বাবুরা সায়ন্তনকে মডেল করার প্রস্তাব নিয়ে আসেন সেই সময়। চিত্রাদেবী না করেননি। কর্তা বাড়ি নেই। পরে যখন জানবেন, খুব একটা রাগ করতে পারবেন না, সুজয়বাবুরা তো ওঁর স্কুলের বন্ধু। দুর্ঘটনা ঘটল সেই অ্যাডের ফোটো তোলার দিন। লোডশেডিং, এসি বন্ধ। সায়ন্তনকে অনেকক্ষণ বসে থাকতে হয়েছিল স্টুডিও ফ্লোরে। অসুস্থ হয়ে পড়ে সে। পরে জানা গিয়েছে স্টুডিওয়ে আসার আগে মায়ের দেওয়া ব্রেকফাস্টটা জানলা গলিয়ে ফেলে দিয়েছিল সানি। যেমন প্রায়ই দিত। খালি পেটে ছিল সেদিন। খিদে পেয়েছে, বলতেও পারেনি মাকে। ব্রেকফাস্ট ফেলে দেওয়াটা ধরা পড়ে যাবে। ধকল সহ্য হয়নি। পরের দিন মারা গিয়েছিল নার্সিং হোমে। বিদেশ থেকে সেই রাতেই ফিরে আসেন ডাঃ রায়। শুটিংয়ের ঘটনাটা শোনেন। সমস্ত রাগ গিয়ে পড়ে অ্যারো কোম্পানির উপর। মুখে কিন্তু কিছু বলেন না। আদ্যোপান্ত ভভ্রলোক তিনি। মনে-মনে ঠিক করে নেন, অ্যারো কোম্পানিকে দেউলিয়া করে ছাড়বেন। প্রবল শোকে কোনও-কোনও মানুষের মধ্যে এরকম প্রতিশোধ-স্পৃহা জাগে। কিন্তু কথা হচ্ছে, সায়ন্তনের মৃত্যুর জন্য সুজয়বাবুরা কতটা দায়ী। মৃত্যু যেভাবে হয়েছে তাতে বোঝা যায়, ছেলেটি ছোট থেকেই কোনও অসুখে ভুগছিল। ব্যাপারটা নিশ্চিতভাবে জানতে, আমি নার্সিং হোমে ভর্তি হয়ে চুরি করি সায়ন্তনের চিকিৎসার ফাইল। সেই রাতে আরও কয়েকটা কাজ সারি। সুজয়বাবুকে ভর্তি করে প্রথমেই বুকের এক্স রে করা হয়। প্লেটটা আমি হাতিয়ে নিই। ডাঃ রায়ের পুরো নার্সিং হোমটার আনাচকানাচে সন্ধান চালাই, যদি কেস সম্পর্কিত আরও কোনও ক্লু পাওয়া যায়। সেই সময়টা আমার বেডে শুয়ে প্রক্সি দিচ্ছিল আমার এক পুলিশবন্ধু। সে ভিজিটিং আওয়ার্সে এসে টয়লেটে লুকিয়েছিল। সময়মতো আমার বেড়ে চলে যায়।"

নিশ্চয়ই রঞ্জনকাকু, আন্দাজ করতে পারে ঝিনুক। প্রত্যেকটা কেসে

boierpathshala.blogspot.com

উনি ভীষণভাবে সাহায্য করেন দীপকাকুকে। ডিউটি করেন লালবাজার কন্ট্রোলে। ঝিনুক ক'দিন ধরে ভাবছিল, কেন এই কেসে এখনও ওঁর এন্ট্রি হয়নি। দেখা যাচ্ছে প্রবেশ-প্রস্থান দু'টোই সারা হয়ে গিয়েছে।

দীপকাকু বলে যাচ্ছেন, "পরের দিন নার্সিং হোম থেকে আমাকে রিলিজ করা হয়। বাড়িতে বসে সায়ন্তনের ফাইল খুলি। ডাক্তার অলকেশ সেনের নাম পাই। যিনি একজন নামী হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ। ফাইল এবং সুজয়বাবুর বুকের এক্স রে নিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করি। সায়ন্তনের ফাইল দেখে উনি বলেন, ডাঃ রায় ওঁর বন্ধু। সায়ন্তনের হার্টে জন্ম থেকেই একটা বড় গোলমাল ছিল। যে-কোনও মুহূর্তে ওর আয়ু সংক্ষিপ্ত হতে পারে। তবে চিকিৎসাবিজ্ঞানে ওই ধরনের রোগ নিয়ে জোরকদমে রিসার্চ চলছে। ব্যাড লাক, রিসার্চ ফলপ্রসূ হওয়ার আগেই চলে গেল সায়ন্তন। ওর রোগটার কথা চিত্রাদেবীর কাছে গোপন করে গিয়েছিলেন ডাক্তারবাবু। স্ত্রীকে রেহাই দিয়েছিলেন চিরকালীন উৎকণ্ঠা থেকে। শেষ রক্ষা হল না।"

চেয়ারের পাশ থেকে ব্রিফকেসটা টেবিলে তুললেন দীপকাকু। বললেন, "এতেই আছে আমার সাক্ষ্যপ্রমাণাদি।"

খুলে ফেললেন বাক্স। বের করলেন একটা ফাইল। বললেন, "এর মধ্যে আছে সায়ন্তনের সব রিপোর্ট।" এর পর বেরোল একটা ফ্লপি এবং চারটি ফুল সাইজের ফোটো। দীপকাকু বললেন, "এই ফ্লপিটা চুরি গিয়েছিল লকার থেকে। অ্যারো কোম্পানি সায়ন্তনের চারটে পোজে ফোটো তুলেছিল, ফোটোগুলো আমি ডাউনলোড করে নিয়েছি।"

ঝিনুক ফোটোগুলো নিয়ে দ্যাখে, ভাল লাগে সেই স্ন্যাপটাই, চিত্রাদেবীর চেম্বারে যেটা লাগানো ছিল। এটা তারই কপি। দীপকাকু সুজয়বাবুর দিকে তাকিয়ে বলেন, "এবার আমি এমন একটা কথা বলব, আপনি কিন্তু ঘাবড়ে যাবেন না। বাস্তবিক ঘাবড়ানোর কিছু নেই।"

"আমি ঠিক আছি। আপনি বলুন।" আশ্বস্ত করেন সুজয়বাবু।

দীপকাকু এবার বের করলেন একটা এক্স রে প্লেট। বললেন, "এটি সুজয়বাবুর বুকের ছবি।" প্লেটের এক জায়গায় আঙুল রেখে দীপকাকু বলে যান, "ডাঃ সেন এই বস্তুটি কী, ঠিক বুঝতে পারেননি। পেসমেকারের পাশে বসানো হয়েছে, পাঁজরের উপর। আমি এটা নিয়ে যাই ফরেনসিক ল্যাবে। তাঁরা পরীক্ষা করে বলেন, এটি একটি উন্নত প্রযুক্তির মাইক্রোফোনের ছবি, ব্যাটারিচালিত। হাফ ইঞ্চি সাইজ। চামড়ার তলায় থেকেও অনেক দূরের শব্দ ক্যাচ করতে পারে। আমি বুঝে যাই কাণ্ডটি ঘটিয়েছেন ডাঃ রায়। যখন সুজয়বাবুর পেসমেকার বসান। পাছে অন্য নার্সিং হোমে গেলে ব্যাপারটা ধরা পড়ে যায়, সেই কারণেই তাড়াহুড়ো করে সুজয়বাবুকে ভর্তি করেন নিজের নার্সিং হোমে। মাইক্রোফোনটি ডাঃ রায় কিনেছিলেন টোকিও থেকে। সায়ন্তন মারা যাওয়ার পর ডাঃ রায় মেডিক্যাল কনফারেন্সে একবার টোকিও যান। ওখানকার মার্কেটে এসব জিনিস আকছার মেলে। ছোট্ট মাইক্রোফোনটির ক্ষমতা এতটাই, রিসিভার সেন্টারে পঞ্চাশ-ষাট কিলোমিটার দূরে থাকলেও চলে। সেন্টারটি ছিল ডাঃ রায়ের চেম্বারের পাশের ঘরে। তালা ভেঙে সেখানে আমায় ঢুকতে হয়েছে, সার্চ করে পাই পোর্টেবল ডিশ অ্যান্টেনা আর ল্যাপটপ। ল্যাপটপের সাহায্যে স্যাটেলাইটের ফ্রিকোয়েন্সি ম্যাচ করে রিসিভ করা হত মাইক্রোফোনের আউটপুট। সুজয়বাবুর আশপাশের সমস্ত কথা চলে আসত সেন্টারে। রেকর্ডেড হত সেগুলো। সময়মতো গিয়ে সেসব শুনতেন ডাঃ রায়। খুবই সহজ হয়ে গিয়েছিল অ্যারো কোম্পানি তুলে দেওয়ার কাজ।" থামলেন দীপকাকু। ঝিনুক লক্ষ করে বাবাকে, চোখ জ্বলজ্বল করছে, এখানেও জাপানের জয়গান। মাইক্রোফোন, যন্ত্রপাতি যা পাওয়া গিয়েছে, সবই টোকিওর। দীপকাকু ফের শুরু করেন, "সন্তানশোক ডাক্তারবাবুকে পাগল করলেও, বুদ্ধি নষ্ট করে দেয়নি। নানান চালে তিনি পর্যুদস্ত করছিলেন ভুল প্রতিপক্ষকে। যেমন একটা উদাহরণ দিই, গৌতমবাবু প্রেশার চেক করাতে গেলেন ডাঃ রায়ের কাছে। ওঁর মোবাইল থেকে মেসেজ পাঠানো হল ক্লায়েন্টকে। এক ফাঁকে অতি ক্ষিপ্রতায় কাজটি সেরেছিলেন ডাঃ রায়।"

বড় একটা শ্বাস নিয়ে একেবারেই চুপ করে গেলেন দীপকাকু। প্রত্যেকেই অবাক হয়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে আছেন, ডাঃ রায় ছাড়া। টেবিলে মাথা নামিয়ে দিয়েছেন উনি।

চশমার কাচ মুছে, গলা খাদে রেখে দীপকাকু বলতে থাকেন, "শোকসন্তপ্ত পিতার এই অদ্ভুত অপরাধের জন্য আপনারা কী শাস্তি দেবেন, নিজেরাই ঠিক করুন। পুলিশের কাছে যদি যান, আমি সাক্ষ্যপ্রমাণগুলো দিতে পারি। আপাতত আমার কাজ শেষ। শুধু একটা কথা, আপনারা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব, সুজয়বাবুর বুক থেকে মাইক্রোফোনটি বের করার ব্যবস্থা করুন।"

দীপকাকু ব্রিফকেস গুছিয়ে নিচ্ছেন। ঝিনুক সায়ন্তনের একটা ফোটো তুলে নেয়। যে ফোটোটা তার সবচেয়ে পছন্দের। রোল করে রাখে নিজের কাছে।

এতক্ষণ ঘরের সবাই যেন হিপ্‌নোটাইজড হয়ে বসেছিল। সম্বিৎ ফিরছে। ডাঃ রায়ের কোনও বিচলন নেই। একই ভঙ্গিতে রয়েছেন অনেকক্ষণ। সুজয়বাবু আলতো করে পিঠে হাত রাখেন বন্ধুর। বলেন, "কী হল তোর, এরকম করে আছিস কেন? তোর কষ্টটা আমরা বুঝি!"

মাথা তোলেন ডাঃ রায়। চোখ ভেসে যাচ্ছে জলে। জড়ানো গলায় বলেন, "আমায় ক্ষমা করে দে সুজয়। ছেলেটা সব সময় আমার কানের কাছে বলে, 'বাবা, তুমি এত বড় ডাক্তার হয়েও আমাকে বাঁচাতে পারলে না।' কই, ওর মাকে, তোদেরকে তো কিছু বলে না! ছেলেটাকে অভুক্ত রেখে তোরা শুটিং চালিয়ে গিয়েছিস?"

"শান্ত হ', শান্ত হ' অজিত।" পিঠে হাত বুলিয়ে দিতে-দিতে বলেন সুজয়বাবু। পার্থবাবু, গৌতমবাবু এগিয়ে আসছেন সান্ত্বনা দিতে। ঝিনুকরা উঠে পড়ে।

কেসটা বড় করুণভাবে শেষ হল। গাড়িতে বাবা, দীপকাকু দু'জনেই গুম মেরে বসে আছেন। মনের ভার কমাতে ঝিনুক হাতে রাখা ফোটোটা খোলে। সায়ন্তনের হাসিটা সত্যিই কী প্রাণবন্ত। কে বলবে, ওর বুকে মারাত্মক রোগবালাই বাসা বেঁধে ছিল! ফোটোটা আজ যেন বেশি হাসছে। হবে না কেন, সানির কষ্টটা এতদিন ওর বাবা বয়ে বেড়াচ্ছিলেন। সেটা বাইরে এনে দিয়েছেন দীপকাকু। সায়ন্তন তাই খুব খুশি। ঝিনুকের আপশোস হয়, ছেলেটার সঙ্গে আলাপ হল ঠিকই, কিন্তু অনেক দেরিতে। যখন ও আর নেই।

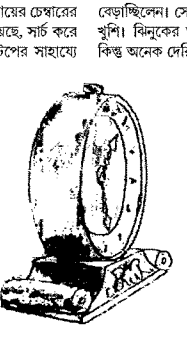

pathagar.net

boierpathshala.blogspot.com

BOOKS IN PDF

To get free e-books

Step 1

Click here

Step 2

Click here

Request or suggest book

boierpathshala.blogspot.com